তাওহীদের ডাক

৪৮ তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০
Web : www.tawheederdak.com

- হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফের কুরআনী খেদমত
- যুগে যুগে ইমাম মাহদী দাবীদারগণ
- মৃত্যুর ধ্রুব বাস্তবতা ও আমরা!
- মধ্যযুগে ওছমানীয়রা কেন প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করেনি?
- সাক্ষাৎকার : জনাব আব্দুর রহমান (সাতক্ষীরা)

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৪৮ তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭১৫২০৯৬৭৬
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়**
  নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ : সমাধান কোথায়? ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা**
  হিংসা ৩
- **আক্বীদা**
  মৃত্যু : একটি ধ্রুব বাস্তবতা ও আমরা! ৫
  মুজাহিদুল ইসলাম
- **তাবলীগ**
  মীমাংসা : শারঈ দৃষ্টিকোন ৯
  আসাদ বিন আব্দুল আযীয
- **তানযীম**
  মুসলিম ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ ১৪
  ওমর ফারূক
- **তারবিয়াত**
  কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়তর ১৮
  মিনারুল ইসলাম
- **তাজদীদে মিল্লাত**
  যুগে যুগে ইমাম মাহদী দাবীদারগণ ২১
  আব্দুর রউফ
- **সাক্ষাৎকার** ২৫
  জনাব আব্দুর রহমান
- **মনীষীদের লেখনী থেকে**
  শতবর্ষ পূর্বে মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে
  মাওলানা আকরম খাঁ'র উপলব্ধি ৩২
- **ধর্ম ও সমাজ**
  নারীর তিনটি ভূমিকা ৩৮
  লিলবর আল-বারাদী
- **চিন্তাধারা**
  মধ্যযুগে ওছমানীয়রা প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করেনি কেন? ৪২
  উলুবাতলি হাসান
- **সমকালীন মনীষী**
  ড. মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান আল-আ'যমী ৪৭
  আব্দুল হাকীম
- **পরশ পাথর** ৫০
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে**
  হতাশায় ভোগা যুবসমাজ ৫২
- **সংগঠন সংবাদ** ৫৩
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৬

সম্পাদকীয়

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ : সমাধান কোথায়?

সম্প্রতি বাংলাদেশ জুড়ে ভয়াবহ কয়েকটি ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা সারা দেশ নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। মানুষ পাশবিকতার চরমতম পর্যায়ে না পৌঁছালে তার পক্ষে এমন বর্বরতার জন্ম দেয়া অসম্ভব। অথচ এই অচিন্তনীয় ঘটনাই এখন বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার নিত্য-নৈমিত্তিক খবর। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে মাত্র গত নয় মাসে করোনা মহামারীর ভয়াবহ বিপর্যয় ও লকডাউনের মত কার্যত কার্ফ্যু পরিস্থিতির মধ্যেই ৯৭৫টি ধর্ষণের ঘটনা পুলিশ রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে গণধর্ষণের মত ভয়ংকর অপরাধ ছিল ২০৮টি। এদের মধ্যে ৪৩জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। আর লজ্জায়-অপমানে আত্মহত্যা করেছে আরো ১২ জন নারী। এগুলো শুধু রেকর্ডভুক্ত ঘটনা। প্রকৃত সংখ্যা যে কয়েকগুণ বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা এ ধরণের ঘটনার মাত্র ২০ শতাংশই প্রকাশ পায়। মান-সম্মানের ভয়ে লোকলজ্জায় বাকি ঘটনাগুলো অপ্রকাশিত থাকে। এর বাইরে করোনাকালীন পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে নিহত হয়েছে আরো ২৭৯ জন নারী। আর নির্যাতনে আত্মহত্যা করেছে ৭৪ জন নারী।

উপরোক্ত তথ্যগুলো থেকে কিছুটা হলেও আঁচ করা যায়, আমাদের সমাজ নারীদের নিরাপত্তা দিতে কতটা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং কিভাবে এ সমাজে নারীরা মর্মান্তিক নির্যাতন ও নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। অথচ দেশবিধায়কগণ দাবী করেন, দেশের আইন-কানূন ও সমাজব্যবস্থা নাকি নারীবান্ধব করে গড়ে তোলা হয়েছে! বস্তুতঃ প্রচলিত এই নারীবান্ধব সমাজ গড়ার শ্লোগান যে নারীকে কতটা অরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ফেলে দিয়েছে, তা আমাদের দায়িত্বশীলগণ যতদিন পর্যন্ত উপলব্ধি না করবেন, ততদিন নারীর জন্য নিরাপদ সমাজ গড়ার দাবী অবান্তরই প্রতীয়মান হবে।

সচেতন পাঠক! নারী নির্যাতন কেন হয়? বাংলাদেশের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে কেন এক শ্রেণীর বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ ধর্ষণের মত বর্বরতায় লিপ্ত হচ্ছে? কেন ধর্ষণের পরিসংখ্যানে বাংলাদেশ মুসলিম দেশগুলির মধ্যে প্রথম? এই ধর্ষণ মনোবৃত্তির মূল উৎস কোথায়? এই প্রশ্নগুলি উত্তর আমাদের খোঁজা দরকার। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হ'ল- ধর্ষণ যখন মহামারীর আকার ধারণ করে তখন তা কেবল ব্যক্তিগত অপরাধ থাকে না, বরং সেই অপরাধের দায় সমগ্র সমাজের উপর পড়ে। যেই সমাজে মানবিক মূল্যবোধের চর্চা নেই, নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন নেই, আইনের শাসন নেই, সেই সমাজে এই ধরণের অপরাধ যে ধারাবাহিক চলতেই থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাহলে কি আমাদের সামাজিক পরিমণ্ডলই এই ধর্ষক উৎপাদনের উর্বর রসদ যোগান দিচ্ছে? আসুন! বিষয়টি যাচাইয়ের চেষ্টা করি।

প্রথমতঃ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন যে, বর্তমানে ধর্ষণ মনোবৃত্তি তৈরীতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে মিডিয়া। পত্র-পত্রিকা ও সিনেমা-টিভিতে নারীকে যেভাবে অশালীনভাবে উপস্থাপন করা হয়, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, যুবসমাজের মধ্যে বিকৃত মানসিকতা ঢুকিয়ে দেয়ার প্রাথমিক কাজটি মূলতঃ মিডিয়াই নিয়মিতভাবে আঞ্জাম দিচ্ছে। আর এর সাথে আরো ভয়ংকরভাবে যুক্ত হয়েছে অবাধ আকাশ সংস্কৃতির নীল দংশন, যার বিষাক্ত ছোবলে একশ্রেণীর যুবসমাজের মন-মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলেছে। সুতরাং আইন যতই কঠোর করা হোক না কেন, যদি মিডিয়ার এই জঘন্য উৎসমুখ বন্ধ না করা যায়, তবে কখনই সুস্থ ও নিরাপদ সমাজব্যবস্থা কামনা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপন সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য যেন একটিই- নারী-পুরুষের অনৈতিক সম্পর্ককে উৎসাহিত করা। নারী-পুরুষ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে সেখানে এত স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন তা কোন অপরাধের সংজ্ঞাতেই পড়ে না। ফলে যেনা-ব্যভিচারের বিস্তার দিন দিন বাড়ছে। নারী-পুরুষ সহজেই তাদের ইয্যত-আব্রু বিকিয়ে দিচ্ছে। এর বিপরীতে বিবাহ তথা বৈধ সম্পর্ককে দিন দিন করা হচ্ছে কঠিন থেকে কঠিনতর। পরিবার থেকে যেমন দ্রুত বিবাহকে উৎসাহ দেয়া হয় না, তেমনি সমাজও দ্রুত বিবাহকে অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখে। ফলে একদিকে নারী-পুরুষের বৈধ সম্পর্কের পথ কঠিন হয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে সহজসাধ্য হচ্ছে অনৈতিক সম্পর্ক, যেনা-ব্যভিচার।

তৃতীয়তঃ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও সহশিক্ষা অনৈতিকতা বিস্তৃতির অন্যতম কারণ। নারী শিক্ষা, নারী উন্নয়ন তথা নারীর কর্মসংস্থানের নামে বর্তমানে যে প্রোপাগাণ্ডা চলছে, তার একটিই উদ্দেশ্য নারীদেরকে চাকুরীর প্রলোভন দেখিয়ে ঘর থেকে বের করে জীবন-জীবিকার কঠিন ময়দানে নামিয়ে দেয়া। তাতে সমস্যা ছিল না, যদি তাদের জন্য স্বতন্ত্র ও নিরাপদ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া হ'ত। কিন্তু তাদেরকে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় লাগিয়ে দিয়ে রীতিমত যুদ্ধে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে সহশিক্ষার নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পবিত্র অঙ্গনে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদেরকে অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। নৈতিকতার মহা পরীক্ষায় সেখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হতে পারে না। ফলে মানবীয় প্রবৃত্তির দুর্বলতম অংশের কাছে পরাজিত হয়ে অতি সহজে তারা অনৈতিকতার পথে পা বাড়াচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে পাপ-পঙ্কিলতার মহাসাগরে। এদেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখন যেন ইভটিজিং, যেনা-ব্যভিচার ও অবাধ যৌনাচারের অনুশীলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। জোড়ায় জোড়ায় অন্তরঙ্গভাবে বসে থাকা নর-নারীর প্রকাশ্য অপকর্মে শয়তানও বোধহয় লজ্জিত হয়। অথচ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে নীরবে আমরা তা হযম করে চলেছি অহর্নিশ।

চতুর্থতঃ পথেঘাটে নারীর পর্দাহীন এবং অশালীন চলাফেরা নিঃসন্দেহে ধর্ষকদের কুপ্রবৃত্তি তৈরীতে বড় ভূমিকা রাখছে। নৈতিক মূল্যবোধ, লজ্জাশীলতা ও ইসলামের দেয়া নীতিমালাকে অবজ্ঞা করে একজন নারী যখন অশালীন পোষাকে ঘর থেকে বের হয়, তখন সে যেন সমাজের কীটগুলোকে অনৈতিকতার দিকে প্রচ্ছন্ন আহ্বান জানায়। সুতরাং আধুনিক নারীবাদীরা ধর্ষণের পিছনে পর্দাহীনতার পরোক্ষ দায় যতই আড়ালের চেষ্টা করুক না কেন, যতদিন নারী স্বেচ্ছাচারী ও পর্দাহীন থাকবে, ততদিন নারীর প্রতি সহিংসতা বিদূরিত হওয়া দুরাশাই থাকবে।

পঞ্চমতঃ যদিও সরকার ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে, কিন্তু সেই আইনের বাস্তবায়ন না হওয়া এবং প্রচলিত বৃটিশ বিচারব্যবস্থার সীমাহীন দুর্বলতাও নারী নির্যাতন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ২০০১ থেকে ২০২০ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত নারী নির্যাতন মামলা সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ পর্যন্ত আদালতে মাত্র ৩.৫৬% মামলার রায় হয়েছে। *[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]*

হিংসা

আল-কুরআনুল কারীম :

১– وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ– قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ–

(১) ‘আমরা তোমাদেরকে (অর্থাৎ আদমকে) সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আকৃতি দান করেছি। অতঃপর ফেরেশতাদের বলেছি তোমরা আদমকে সিজদা কর। অতঃপর তারা সিজদা করেছে ইবলীস ব্যতীত। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লাহ বললেন, আমি যখন তোমাকে নির্দেশ দিলাম, তখন কোন বস্তু তোমাকে বাধা দিল যে তুমি সিজদা করলে না? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে’ *(আ‘রাফ ৭/১১-১২)*।

২– وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ– لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ–

(২) ‘((হে নবী!) তুমি লোকদের নিকট আদমের দুই পুত্রের ঘটনা সত্য সহকারে বর্ণনা কর। যখন তারা কুরবানী পেশ করে। অতঃপর একজনের কুরবানী কবুল হয়, কিন্তু অপর জনের কুরবানী কবুল হয়নি। তখন সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। জবাবে সে বলল, আল্লাহ তো কেবল মুত্তাক্বীদের কুরবানী কবুল করে থাকেন’। ‘যদি তুমি আমার দিকে হাত বাড়াও আমাকে হত্যা করার জন্য, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি’ *(মায়েদাহ ৫/২৭-২৮)*।

৩– وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ–

(৩) ‘সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ বশতঃ আহলে কিতাবদের অনেকে তোমাদেরকে ঈমান আনার পরেও কাফির বানাতে চায়। এমতাবস্থায় তোমরা ওদের ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল আল্লাহর আদেশ না আসা পর্যন্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান’ *(বাক্বারাহ ২/১০৯)*।

৪– أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا– فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا–

(৪) ‘তবে কি তারা লোকদের (মুসলমানদের) প্রতি এজন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ থেকে তাদের কিছু দান করেছেন। আর আমরা তো ইবরাহীমের বংশধরগণকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল সাম্রাজ্য। অনন্তর তাদের মধ্যে কেউ তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনেকেই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বস্তুতঃ তাদের জন্য জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিই যথেষ্ট’ *(নিসা ৪/৫৪-৫৫)*।

হাদীছে নববী :

৫– عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ.

(৫) হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন ‘তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ করো না, হিংসা করো না, একে অপরকে পরিত্যাগ করো না, একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা পরস্পরে আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের তিনদিনের বেশী কথা পরিত্যাগ করা বৈধ নয়’।[১]

৬– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا–

(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা সমূহ খোলা হয়। এ দু’দিন বান্দার আমলনামা আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়। অতঃপর আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি এমন সবাইকে মাফ করা হয়। কেবল ঐ দু’জন ব্যতীত যাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বিদ্যমান রয়েছে। বলা হয়, এদের ছাড়, যতক্ষণ না এরা আপোষে মীমাংসা করে নেয়’।[২]

৭– عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِى نَفْسى بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

(৭) যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের রোগ তোমাদের মধ্যে গোপনে প্রবেশ করবে। আর তা হ’ল হিংসা ও বিদ্বেষ, যা সবকিছুর মুণ্ডনকারী। আমি বলছি না, চুল মুণ্ডনকারী। বরং তা হবে দ্বীনকে মুণ্ডনকারী। যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি,

১. *তিরমিযী হা/১৯৩৫।*
২. *মুসলিম হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/৫০২৯।*

তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে। আর তোমরা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের খবর দিব না, কোন বস্তু তোমাদের মধ্যে ভালবাসাকে দৃঢ় করবে? তোমরা পরস্পরে বেশী বেশী সালাম কর'।[৩]

৮- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ.

(৮) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকবে, কেননা এ-ই হ'ল দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয়।

৯- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِى النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِى جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِى قَلْبِ عَبْدٍ الإِيمَانُ وَالْحَسَدُ.

(৯) আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে মুসলিম কোন কাফেরকে হত্যা করে নিজেও সঠিক পথে চলেছে, সে এবং ঐ কাফের জাহান্নামে একত্রিত হবে না। কোন মুমিনের অন্তরে আল্লাহ্র পথের ধুলা এবং জাহান্নামের উত্তাপ একত্রিত হবে না। অনুরূপ কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না'।[৪]

১০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ. قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِىُّ النَّقِىُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ.

(১০) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, একদা মহানবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক কে? উত্তরে তিনি বললেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক হ'ল সেই, যার হৃদয় হ'ল পরিষ্কার এবং জিহ্বা হ'ল সত্যবাদী। জিজ্ঞাসা করা হ'ল, পরিষ্কার হৃদয়ের অর্থ কী? বললেন, যে হৃদয় সংযমশীল, নির্মল, যাতে কোন পাপ নেই, অন্যায় নেই, ঈর্ষা ও হিংসা নেই। জিজ্ঞাসা করা হ'ল, তারপর কে? বললেন, যে দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং আখেরাতকে ভালোবাসে। জিজ্ঞাসা করা হ'ল, তারপর কে? বললেন, সুন্দর চরিত্রের মুমিন'।[৫]

১১- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ.

(১১) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুহাম্মাদ এর প্রাণ যার হাতে তাঁর কসম! তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের ভাইয়ের জন্য সেই কল্যাণ পসন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে থাকে'।[৬]

১২- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

(১২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন: পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের জন্য নিলাম ডেকে দাম বাড়াবে না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যেও না, একজনের ক্রয়ের উপর অন্যজন ক্রয় করো না। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর যুলুম করে না এবং তাকে সঙ্গীহীন ও সহায়হীনভাবে ছেড়ে দেয় না। সে তার কাছে মিথ্যা বলে না ও তাকে অপমান করে না। তাক্বওয়া হচ্ছে, এখানে, তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। কোন মানুষের জন্য এতটুকু মন্দ যথেষ্ট যে, সে আপন মুসলিম ভাইকে নীচ ও হীন মনে করে। এক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য মুসলিমের জন্য হারাম'।[৭]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'হিংসুক ব্যক্তি ইবলীসের ন্যায়। সে শয়তানের অনুসারী। কেননা সে শয়তানের চাহিদা মত সমাজে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় এবং অন্যের উপর আল্লাহ্ও দেয়া নে'মতসমূহের ধ্বংস কামনা করে। যেমন ইবলীস আদমের উচ্চ মর্যাদা ও তার শ্রেষ্ঠত্বকে হিংসা করেছিল এবং তাকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। অতএব হিংসুক ব্যক্তি ইবলীসের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত'।[৮]

২. আবু হাতেম দারেমী (রহঃ) বলেন, হিংসা হ'ল নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্র এবং তা পরিত্যাগ করা হ'ল মর্যাদাবান ব্যক্তিদের কর্ম। আর প্রত্যেক আগুনের নির্বাপক আছে। কিন্তু হিংসার আগুন নির্বাপিত হয় না'।[৯]

সারবস্তু :

১. হিংসুক ব্যক্তি অপরের ক্ষতি করার চেয়ে নিজের অজান্তে হিংসার আগুনে নিজেকেই বেশী দগ্ধ করে থাকে।

২. হিংসা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। কিন্তু দয়া, ভালবাসা ও সহমর্মিতা মহান আল্লাহ্র দান। সুতরাং হিংসুক পরোক্ষভাবে শয়তানকেই খুশী করে।

৩. হিংসা এমন এক অভিশাপ যা হিংসুককে তিলে তিলে জাহান্নামের পথে ঠেলে দেয়।

৪. হিংসার সবচেয়ে খারাপ পরিণতি হল, সে অন্য মানুষকেও নিজের মত ভাবতে থাকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫. হিংসুকরা হিংসার কারণে সমাজে ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হয় এবং ইতিহাসের আস্তাকুড়ায় নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে আবহমানকাল তারা সাধারণত মানুষের লা'নতের খোরাকে পরিণত হয়।

---

৩. তিরমিযী হা/২৫১০, মিশকাত হা/৫০৩৯, হাদীছ হাসান ।
৪. নাসাঈ হা/৩১০৯; ত্বাবারানী কাবীর হা/১৪৪; ইবনে হিব্বান হা/৪৬০৬।
৫. ইবনে মাজাহ হা/৪২১৬, ছহীহুল জামে' হা/ ৩২৯১।
৬. নাসাঈ হা/ ৫০১৭; ছহীহাহ হা/৭৩।
৭. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯।
৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, বাদায়ে'উল ফাওয়ায়েদ ২/২৩৪।
৯. আবু হাতেম দারেমী, রওযাতুল উক্বালা ১৩৪ পৃ. ।

মৃত্যু : একটি ধ্রুব বাস্তবতা ও আমরা!

-মুজাহিদুল ইসলাম

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী এবং চিরস্থায়ী জীবনের একমাত্র সেতুবন্ধন হ'ল মৃত্যু। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের জীবনাবসান হয় না বরং জীবনের এক চিরস্থায়ী অধ্যায় শুরু হয়। এটা এমন এক সত্য, যেটা প্রত্যেক ধর্মের মানুষ এমনকি নাস্তিকরাও বিশ্বাস করে। মহান আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ 'তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। অতঃপর আমরা তোমার সম্মুখ থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজকে তোমার দৃষ্টি হবে প্রখর' *(ক্বাফ ৫০/২২)*।

কিন্তু আমরা দুনিয়াকে পেয়ে আখেরাতকে ভুলতে বসেছি। নিম্নে মৃত্যু সংক্রান্ত কিছু বিষয় এবং আমাদের দুনিয়াবী চিন্তাধারার সাথে কুরআন হাদীছের সামঞ্জস্যতা কতটুকু সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হ'ল।

মৃত্যুর যন্ত্রনা রয়েছে যা সবাইকেই ভোগ করতে হবে :

মৃত্যুর প্রথম লক্ষণ হ'ল সাকরাতুল মাউত তথা মৃত্যু যন্ত্রণা। কুরআন ও হাদীছে 'সাকারাতুল মাউত' সম্পর্কে বিবরণ এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ 'মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবে। এটা থেকেই তুমি পালাতে চাচ্ছিলে' *(ক্বাফ ৫০/১৯)*।

'সাকারাতুল মাউত' অর্থ মৃত্যুযন্ত্রণা। এটা খুবই অসহনীয় যন্ত্রণা। তবে মৃত্যু যন্ত্রণার মুখোমুখি হওয়া মানুষের খারাপ হওয়ার চিহ্ন নয়। কেননা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মৃত্যুর প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে চামড়ার অথবা কাঠের একপাত্রে কিছু পানি রাখা ছিল। তিনি তাঁর হাত ঐ পানির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন। এরপর নিজ চেহারা দু'হাত দ্বারা মুছে দিতেন আর বলতেন لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ 'লা-ইলাহা ইলাল্লাহু' নিশ্চয়ই মৃত্যুর অনেক যন্ত্রণা। এরপর দু'হাত তুলে বলতে লাগলেন, فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى 'হে আল্লাহ! আমাকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নদের মাঝে গণ্য করে নিন'। এ অবস্থাতেই তাঁর জান কবয করা হ'ল এবং তাঁর হাত দু'টো এলিয়ে পড়ল'।[১]

মৃত্যুর ফেরেশতা যখন উপস্থিত হয়, মৃত্যুপথযাত্রী তাদেরকে দেখতে পান। যদিও তখনও তিনি দুনিয়ার বুকে জীবিত থাকেন, তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন অনুশোচনা এবং ক্ষমা লাভের সকল আশা শেষ হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ 'রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত) পর্যন্ত মহান আল্লাহ্‌র বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন'।[২]

কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, পৃথিবীর এই চিরন্তন সত্য মৃত্যুকে আমরা সবচেয়ে বেশী ভুলে থাকি। দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্য যেন আমাদেরকে মৃত্যুর স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছে। আমরা এমনভাবে দুনিয়ার পিছনে ছুটছি, যেন এটাই আমাদের একমাত্র বাসস্থান। কথিত সৌন্দর্য্য নগদ পেয়ে আমরা ভুলে যাচ্ছি আখেরাতের প্রকৃত সৌন্দর্য্যকে। এজন্যই মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা তো দুনিয়াকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাক। অথচ আখেরাতই উত্তম ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৬-১৭)*। তবে সেই চিরস্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তি নির্ভর করছে আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপর। এই জীবনে যারা আল্লাহ্‌র ভয়ে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। তাঁর বিধি-নিষেধের ব্যাপারে সতর্ক থেকে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করবে। কাল ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা দান করবেন। পক্ষান্তরে দুনিয়াবী জীবনে যারা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত না হবে। স্বেচ্ছাচারী এবং বিধি নিষেধের ব্যাপারে অবহেলা করে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে। আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন। হাদীছে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'আমার ইযযতের কসম! আমি আমার বান্দার মাঝে কখনো দুই ভয়কে একত্রিত করিনা এবং দুই নিরাপত্তাকেও একত্রিত করি না। সুতরাং বান্দা যখন আমাকে দুনিয়াতে ভয় করে, আমি তাকে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তা দান করব। আর যে দুনিয়াতে আমার আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে, কিয়ামতের দিন আমি তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করব'।[৩]

আল্লাহ দুনিয়াতে কীভাবে পাপীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন?

মহান আল্লাহ্‌র বান্দার পাপাচারের কারণে তাকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন। সেটা শুধু পরকালেই নয়, বরং দুনিয়াতেও দিয়ে থাকেন। তবে এই শাস্তি শুধু বিপদ-মুছীবত

১. *বুখারী হা/৬৫১০।*

২. *তিরমিযী হা/৩৫৩৭; মিশকাত হা/২৩৪৩।*

৩. *ইবনু হিব্বান হা/৬৪০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৬; সনদ ছহীহ।*

বা শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পার্থিব জীবনে আমরা অনেক সময় ভাবতে পারি যে- আমি তো অনেক পাপ করেছি, কিন্তু আমার তো বিপদাপদ বা শাস্তি হয়নি। বরং আমি অনেকের চেয়ে তো আরোও ভালো আছি? কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র আমাদেরকে এমনভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন, যেটাকে আমরা সাধারণত শাস্তিই মনে কারি না। আর সেই শাস্তি কেমন আমরা নিম্নোক্ত কথোপকথন থেকেই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

ক্লাস চলাকালীন সময়ে এক ছাত্র তার প্রিয় উস্তাদকে জিজ্ঞেস করল, শায়েখ! আমরা প্রতিনিয়ত কত পাপ কাজ করি, কিন্তু শাস্তি তো পাই না, এর রহস্য কি?

জবাবে শিক্ষক বললেন, আল্লাহ্‌র তোমাকে প্রতিদিন কত উপায়ে শাস্তি দিচ্ছেন তুমি কি তা জানো?

এরপর তিনি ছাত্রটিকে এভাবে বুঝাতে লাগলেন-

আমি তোমাকে কতগুলো প্রশ্ন করছি নিজের সাথে বা অন্যের সাথে মিলিয়ে দেখ তো রহস্য খুঁজে পাও কিনা?

এক. আল্লাহ্‌র কি তোমাকে তাঁর সাথে গোপন আলাপের (মুনাজাত) স্বাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করেন নি?

জেনে নাও, একজন ব্যক্তির জীবনে সবচেয়ে কঠিন বিপদ ও পরীক্ষা হ'ল বক্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়া। আর এ অপরাধের সবচেয়ে বড় শাস্তি হ'ল ভালো কাজ করার জন্য অতি সামান্য তাওফীক্ব পাওয়া।

দুই. তোমার জীবনে কি এমন কত শত দিন পার হয়ে যাচ্ছে না? যেখানে কুরআন তেলাওয়াতের সৌভাগ্য তোমার নছীবে জোটে না? এমনকি তুমি এই আয়াতটি শুনলেও বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হও না! যেখানে আল্লাহ বলেন, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 'যদি এই কুরআন আমরা কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহলে অবশ্যই তুমি তাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হ'তে দেখতে। আর আমরা এইসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা করে' *(হাশর ৫৯/২১)*।

তিন. তুমি কি অসংখ্য দীর্ঘ রাত ঘুমে-নির্ঘুমে কাটিয়ে দিচ্ছো না? যেখানে তুমি তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হও!

চার. তোমার চোখের সামনে দিয়ে কত কল্যাণের মওসুম- রামাযান মাস, যিলহজ্জের দশ দিন ইত্যাদি পার হয়ে যাচ্ছে না? অথচ তোমার সাধ্যমত যে রকম ব্যস্ত থাকা উচিত ছিল সে রকম সুযোগ পাও না! সুতরাং এর চাইতে অধিক শাস্তি আর কি হতে পারে?

পাঁচ. সামান্য ইবাদতেই তুমি কি ক্লান্ত হয়ে যাও না? ইবাদত করতে গেলে অনেক ভারী ও পরিশ্রম বোধ কর না?

ছয়. তুমি কি অধিকাংশ সময় নিজের জিহ্বাটাকে আল্লাহ্‌র যিকির থেকে বঞ্চিত রাখো না?

সাত. প্রবৃত্তি আর কামনাগুলোর সামনে নিজেকে দুর্বল অনুভব করো না?

আট. সম্পদের ভালোবাসা, প্রসিদ্ধি আর প্রতিপত্তি লাভের তীব্র স্বপ্ন দেখো না?

নয়. আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াবী সফলতা অর্জনের আকাঙ্খা বিরতিহীনভাবে তোমাকে কি প্রভাবিত করে না? এটা কি তোমার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হয়ে আছে না?

সুতরাং এ গুলোর চেয়ে অধিক শাস্তি আর কি হতে পারে? জেনে নাও, এই সমস্ত মোহ আর ধোঁকাগুলোই হচ্ছে আমাদের পাপসমূহের ইহকালীন শাস্তি। অতএব ফিরে না আসলে মরণের পর তো প্রতিশ্রুত শাস্তি আছেই!

প্রিয় বৎস! সর্বশেষে তোমাকে একটি নছীহত করছি। নিজেকে এভাবে চলতে দিও না, সাবধান হও। জেনে রাখ, আমাদের জীবনে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নিম্নমানের শাস্তি হ'ল, সম্পদে, স্বাস্থ্যে আর প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সর্বদা মায়াবী অনুভূতি কাজ করা। আর সবচেয়ে বড় শাস্তি হ'ল অন্তরে আখেরাতমুখী অনুভূতির অস্তিত্ব না থাকা। ফলে এক পর্যায়ে অন্তরগুলো বক্র হ'তে হ'তে তা মোহরাবদ্ধ হয় এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

সুতরাং আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন দুনিয়ার মোহ আমাদের গ্রাস না করে ফেলে। পার্থিব মোহ থেকে বাঁচার উপায় রাসূল (ছাঃ) আমাদের বলে দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ 'তোমরা দুনিয়ার স্বাদকে তিক্তকারী জিনিসকে বেশি বেশি স্মরণ কর। আর তা হ'ল মৃত্যু'।[৪] এজন্য আমাদের উচিত হ'ল মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করা। মৃত্যুর জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে মুক্তির জন্য পরকালীন পাথেয় সঞ্চয় করা।

দুনিয়ায় প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কে?

দুনিয়াতে যারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্যকে ঠকাতে পারে, কূটকৌশলী হয়, সাধারণত আমরা তাদেরকে বুদ্ধিমান হিসাবে বিবেচনা করি। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বুদ্ধিমানের সংজ্ঞা ছিল ভিন্ন। একবার এক আনছারী ছাহাবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ 'সবচেয়ে বুদ্ধিমান মুমিন কে? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ 'তোমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি মরণকে স্মরণ করতে পারে এবং মরণের পরবর্তী জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তারাই সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান'।[৫]

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মরণকে যারা বেশী বেশী স্মরণ করে তারাই বেশী বুদ্ধিমান এবং তারাই পরবর্তী জীবনে বেশী সফলতা অর্জন করতে পারবে। দুনিয়াবী জীবনে আমরা যখন কয়েকদিনের জন্য কোন সফরে বের হই, তখন আমরা আগে থেকেই ভেবে রাখি যে, সেখানে গিয়ে কি খাবো, কোথায় থাকবো, কতো টাকা খরচ হ'তে পারে, কখন কোন পোশাক পরিধান করবো ইত্যাদি নানা রকমের প্রস্তুতি থাকে। অথচ আমরা মাত্র কয়েকদিনের জন্য নিজের স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছি, এমনকি আবার ফিরেও আসবো

৪. তিরমিযী হা/২৩০৭; মিশকাত হা/১৬০৭; সনদ ছহীহ।
৫. ইবনে মাজাহ হা/৪২৫৯; সনদ হাসান।

স্বস্থানে। তাতেই আমাদের কতো ধরনের প্রস্তুতি থাকে! পক্ষান্তরে আমরা যে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিবো। সেই সফরটা হবে আমাদের চিরস্থায়ী। আর কখনে ফিরে আসা হবে না। এটা জানা সত্ত্বেও কি আমরা সেই চিরস্থায়ী সফরের জন্য আদৌ কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করছি? কখনো কি চিন্তা করেছি যে, কবরে কিভাবে তিনটি প্রশ্নের জওয়াব দিব? এতোদিন দুনিয়ায় থেকে কি সঞ্চয় করলাম? যখন মহান আল্লাহ আমাদের যৌবন সম্পর্কে, আমাদের পুরা যিন্দেগী সম্পর্কে, আমাদের রুযী সম্পর্কে (হালাল নাকি হারাম) জিজ্ঞাসা করবেন, তখন আমরা কি জওয়াব দিব? হয়ত গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় হয়নি। কারণ দুনিয়াবী প্রতিযোগিতা, সম্পদের প্রতিযোগিতা আমাদের এতটাই ব্যস্ত রেখেছে যে, আমরা আমাদের চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে চিন্তা করার সময়ই পাই না। রাসূল (ছাঃ) সেই ভয়ই করেছিলেন, আমরা সেই আশংকাজনক পরিস্থিতির উপরে দণ্ডায়মান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে দরিদ্রতার ভয় করি না; কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে, যেমন প্রশস্ত করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করবে যেরূপ তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে এই পার্থিব মোহ তোমাদেরকে ধ্বংস করবে, যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল'।[৬] তাই বুদ্ধিমান মুমিন কখনো শুধু দুনিয়ার প্রাচুর্যতায় লালায়িত থাকেন না, বরং তিনি চিরস্থায়ী জীবনের জন্য উত্তম পাথেয় সঞ্চয়ে বেশী মনযোগী হয়।

আমাদের মধ্যে কে প্রকৃত ধনী?

আমাদের নিকটে ধনীর সংজ্ঞা হ'ল, যার পর্যাপ্ত ধন-দৌলত আছে, বাড়ী-গাড়ী আছে সে ব্যক্তিই হ'ল ধনী ব্যক্তি। এবার আসুন! আমরা জেনে নেই আমাদের প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এই ধনীর সংজ্ঞা কীরূপ ছিলো। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفس 'ধনসম্পদের প্রাচুর্যতার নাম ধনী নয়; বরং প্রকৃত সম্পদশালী সেই, যার অন্তর সম্পদশালী'।[৭] আর অন্তরকে ধনী বানানোর অন্যতম উপায় হ'ল অল্পে তুষ্ট থাকা। একদিন রাসূল (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে পাঁচটি উপদেশ প্রদান করছিলেন, যার দ্বিতীয়টি ছিল, وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاس 'আল্লাহর তা'আলা তোমার কিসমতে যা বন্টন করেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকো (যত স্বল্প রূযীই হোক না কেনো), তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী হ'তে পারবে'।[৮] সুতরাং আমাদের রূযী যত কমই হোক না কেন, আমাদের উচিত হবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। ভেবে নিতে হবে আল্লাহর আমাদের রিযিকে এতটুকুই রেখেছেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই সর্বোত্তম। এটা ভেবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করতে হবে। মোদ্দাকথা হ'ল, যে ব্যক্তি হালাল ভক্ষণকারী, অল্পে তুষ্ট এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, সেই হবে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী এবং সুখী মানুষ।

আমাদের প্রকৃত সম্পদ কোনটি?

গরীব-মিসকীনদের মাঝে অধিকাংশই দারিদ্রকে অভিশাপ মনে করে এবং নিজেদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে হতভাগা হিসাবে বিবেচনা করে। অথচ আমরা এটা কখনো ভাবি না যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রেষ্ঠ রাসূল (ছাঃ) কতটুকু সম্পদশালী ছিলেন। তাঁর ছাহাবায়ে কেরামই বা কতটুকু ধণাঢ্য ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) গরীবদেরকে ভালোবাসতেন এবং তাদেরকে তাঁর পাশে স্থান দিতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতের ইবাদতের প্রাক্কালে দো'আ করলেন এই বলে যে, اَللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِين 'হে আল্লাহ্‌র! তুমি আমাকে মিসকীন অবস্থায় জীবিত রাখ, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান কর এবং মিসকীনদের দলে হাশর কর'। রাসূল (ছাঃ)-এর এই দো'আ শুনে আয়েশা (রাঃ) অবাক হয়ে বললেন, لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ 'কেন? হে আল্লাহর রাসূল!' উত্তরে তিনি বললেন, يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحِبِّي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'হে আয়েশা! কোন মিসকীনকে তোমার দুয়ার হ'তে (খালি হাতে) ফিরিয়ে দিও না। খেজুরের একটি টুকরা হলেও প্রদান করিও। হে আয়েশা! মিসকীনদেরকে ভালবেসো এবং তাদেরকে নিজের কাছে স্থান দিও, তাহলে আল্লাহ্‌র তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তোমাকে তাঁর নিকটে রাখবেন'।[৯] সুতরাং আমাদের বাহ্যিক নিদর্শন সুন্দর হওয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হ'ল অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য। কারণ বিচারের মাঠে আল্লাহ তা'আলা কোন সাদা-কালো, আরব-অনাবর, ধনী-গরীব বিবেচনা করে বিচার করবেন না। আল্লাহ তা'আলার নিকট সকল সৃষ্টিই সমান। তাই তিনি বিচার করবেন আমাদের আমল ও অন্তর দেখে। এই মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র তোমাদের চেহারা-ছূরাত ও ধনসম্পদের দিকে তাকান না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের আমলসমূহ এবং অন্তরসমূহ'।[১০] আমল হচ্ছে চিরস্থায়ী সম্পদ। যে ব্যক্তি এই সম্পদ দ্বারা তার অন্তরকে সম্পদশালী করবে সে ব্যক্তিই প্রকৃত ধনী বা সম্পদশালী। দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে যা কিছুই আমরা ব্যবহার করি না কেনো, কোন কিছুই প্রকৃতভাবে আমাদের নয়। আল্লাহ সাময়িকভাবে কিছুদিন ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে রাখেন মাত্র। আমরা

৬. *বুখারী হা/৩১৫৮; মিশকাত হা/৫১৬৩।*
৭. *বুখারী হা/৬৪৪৬; মুসলিম হা/১০৫১; মিশকাত হা/৫১৭০।*
৮. *তিরমিযী হা/২৩০৫; মিশকাত হা/৫১৭১; সনদ হাসান।*
৯. *তিরমিযী হা/২৩৫২; মিশকাত হা/৫২৪৪; সনদ ছহীহ।*
১০. *মুসলিম হা/২৫৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪৩; মিশকাত হা/৫৩১৪।*

দুনিয়াবী জীবনে হয়ত অনেক সম্পদ উপার্জনে করছি, ব্যাংক-ব্যালেন্স, গাড়ি-বাড়ি ও জমা-জমির মালিক হচ্ছি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা আমরা কতটুকু ভোগ করতে সক্ষম হচ্ছি? এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কি বলেছেন, يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِيْ مَالِيْ وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ 'বান্দা আমার মাল, আমার সম্পদ বলে (তথা গর্ব করে)। প্রকৃতপক্ষে তার মাল হ'তে তার (উপকারে আসে) মাত্র তিনটি। যা সে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে বা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছে অথবা দান করে (পরকালের জন্য) সংরক্ষণ করেছে। এছাড়া যা আছে তা তার কাজে আসবে না এবং সে লোকদের (ওয়ারিছদের) জন্য ছেড়ে চলে যাবে'।[১১] সুতরাং আমাদের উচিৎ ক্ষণস্থায়ী সম্পদের প্রতি বেশি মনোযোগী না হয়ে চিরস্থায়ী সম্পদের প্রতি অধিক মনযোগী হওয়া। যেই সম্পদ আমাদের উপকারে আসবে সেই সম্পদের ধনভাণ্ডার তৈরিতে সচেষ্ট থাকা। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ 'তিনটি জিনিস মৃত লাশের সাথে যায়। দু'টি ফিরে আসে এবং একটি তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে গমন করে আত্মীয়-স্বজন, কিছু মাল-সম্পদ এবং তার আমল। পরে জাতি-গোষ্ঠী ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং থেকে যায় তার আমল'।[১২]

বিচার দিবসের কঠিন পরিস্থিতি :

সম্মানীত পাঠকবৃন্দ! মায়ের গর্ভে আমরা প্রায় দীর্ঘ নয় মাস দশ দিন কাটিয়েছি। তারপর আমরা এই পৃথিবীর বুকে আগমন করেছি। এক টুকরো কাপড়ে আবৃত হয়ে অশ্রুবিহীন কান্নায় পিতামাতাসহ সকল আত্মীয়-স্বজনদের মুখে হাসি ফুটিয়ে সেদিন এসেছিলাম আমাদের পিতামাতার অন্তরের অনুরঞ্জক হয়ে। কত খুশি কত আনন্দে মুখরিত ছিল বাড়ির অঙ্গন। তারপর আল্লাহ্র দেয়া মেয়াদকাল ফুরিয়ে গেলেই আমরা পাড়ি জমাবো জীবনের আরেক জগতে। আসার সময় যেমন শূন্য হাতে সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে এসেছিলাম। তেমনি যাওয়ার সময়ও আবার শূন্য হাতে তিন টুকরো কাফনের কাপড়ে আবৃত হয়ে চলে যাব। চলে যাব পিতামাতাকে সন্তানহারা করে, স্ত্রীকে বিধবা করে, সন্তানদের ইয়াতীম করে। আত্মীয়স্বজন সবাই আমাদের মৃত্যুতে কাঁদবে, দুঃখ করবে। কয়েকমাস পর ফের ভুলেও যাবে। দুনিয়াতে আমরা একে অপরকে যতই ভালোবাসি না কেনো, বিচারের মাঠে কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। সবাইকে তার নিজস্ব আমলগুণে প্রতিদান দেওয়া হবে। তাতে বিন্দুমাত্র কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 'কেউ কারো বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*।

যেই মা তার সন্তানকে জীবনের সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসতেন, যে বাবা দাবিহীন সারাজীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার সন্তানকে লালন পালন করেছেন, যে স্ত্রীর পবিত্র চাহনী এবং নিষ্পাপ সন্তানের মায়াবী চেহারা আমাদের যাবতীয় কষ্টকে লাঘব করে, আমাদের অন্তরে প্রশান্তির সুশীতল বাতাস বইয়ে দেয়, যেই ভাই-বোনদের সাথে মিষ্টি মধুর সম্পর্ক জীবনকে আরও মধুময় করেছে। এই প্রিয় মানুষগুলো ক্বিয়ামতের দিন আমাদের চিনবে না, বাবা-মা চিনবে না তাদের কলিজার টুকরা সন্তানকে। ভাই-বোন চিনবে না তাদের আপন সহদরকে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে পলায়ন করবে। এমনকি সন্তানও চিনবে না তার পিতামাতাকে, যারা দুনিয়াতে তার বেঁচে থাকার অক্সিজেন ছিলেন। এব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 'তারপর যেদিন কান-ফাটানো আওয়াজ আসবে। সেইদিন মানুষ তার ভাইকে ছেড়ে পালাবে, আর তার মাকে ও তার বাবাকে, আর তার পতি-পত্নীকে ও তার সন্তান-সন্ততিকে, সেদিন তাদের মধ্যকার প্রত্যেক লোকেরই এত ব্যস্ততা থাকবে যা তাকে বেখেয়াল করে দেবে' *(আবাসা ৮০/৩৩-৩৭)*।

আমরা একটু ভেবে দেখি, কেন, কিসের জন্য বা কাদের জন্য আমরা দুনিয়ায় এতো কষ্ট করে যাচ্ছি? কেন নিজের সর্বস্ব সময়টা শুধু দুনিয়াবী কাজেই ব্যয় করছি। যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ভালোবেসে তাঁর বান্দাদের ডেকে বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে (যাবতীয় দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে) খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দিব'।[১৩]

তাই আসুন! এখনো সময় আছে। এখনো আমাদের নিঃশ্বাস চলছে। এখনো তাওবার দরজা খোলা আছে। ক্ষণে ক্ষণে আমরা দুনিয়াকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আসুন! আমরা আমাদের আমলগুলোকে সুন্দর করি। জান্নাতের পথকে সুগম করায় সর্বদা সচেষ্ট থাকি। পরিশেষে আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাঃ)-এর বক্তব্যটি স্মরণ করতে চাই। তিনি বলেছেন, 'দুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে, আর আখেরাত সম্মুখে আসছে। আর তাদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি রয়েছে। তবে তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা আজ আমলের সময়, এখানে কোন হিসাব নেই। আর আগামীকাল হিসাব-নিকাশ হবে, সেখানে কোন আমল নেই'।[১৪] অতএব আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে দুনিয়ার এই কন্টকাকীর্ণ পথকে ঈমানের সাথে পাড়ি দেয়ার তাওফীক্ব দান করেন। সর্বোপরি আমাদের আখেরাতমুখী বান্দা হিসাবে কবুল করেন। আমীন ছুম্মা আমীন।

[লেখক : ছাত্র, কুল্লিয়া ২য় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

---

১১. মুসলিম হা/২৯৫৯; মিশকাত হা/৫১৬৬।
১২. বুখারী হা/৬৫১৪; মুসলিম হা/২৯৬০; মিশকাত হা/৫১৬৭।
১৩. তিরমিযী হা/২৪৬৬; মিশকাত হা/৫১৭২; সনদ ছহীহ।
১৪. বুখারী হা/৬৪১৭ (তা'লীক্ব); মিশকাত হা/৫২১৫।

মীমাংসা : শারঈ দৃষ্টিকোন

-আসাদ বিন আব্দুল আযীয

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ পরিক্রমায় বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে নিজেদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি হয়। কখনওবা একারণে সম্পর্কচ্ছেদ পর্যন্ত হয়। এই বিচ্ছিন্ন জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার উৎকৃষ্ট মাধ্যম হ'ল মীমাংসা। এতে উভয়ের ভিতরে লালন করা শত্রুতা, রাগ-অভিমান দূর হয়। ফলে পুনরায় নিজেদের মাঝে সৌহার্দপূর্ণ আচারণ ও পারস্পরিক ভালোবাসা জাগ্রত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মীমাংসা সম্পর্কে বলেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরে আপোষ মীমাংসা করে নাও। আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' *(আনফাল ৮/১)*।

মীমাংসার শর্ত :

নিশ্চয় ঈমানের পরিচায়ক হ'ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ছাড়া কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না। এজন্য প্রত্যেকটি মুমিন ব্যক্তি শারঈ নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। অতএব মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশনা وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ 'তোমরা পরস্পরে আপোষ মীমাংসা করে নাও' এটাও মানতে হবে। নচেৎ ঈমান ভেঙ্গে যাবে। নিম্নে বাদী-বিবাদীর মাঝে মীমাংসার শর্তগুলো উপস্থাপন করা করা হ'ল।

১. ইসলামী শরী'আ অনুযায়ী হওয়া :

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, বারীরা (রাঃ) আমার কাছে এসে বলল, আমি আমার মালিক পক্ষের সাথে ৯ (নয়) উকিয়া দেওয়ার শর্তে 'মুকাতাবা' করেছি। প্রতি বছর এক উকিয়া করে দেওয়া হবে। আপনি (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য করুন। আমি বললাম, যদি তোমার মালিক পক্ষ পছন্দ করে যে, আমি তাদের একবারেই তা পরিশোধ করব এবং তোমার ওয়ালা (আযাদ সূত্রে উত্তরাধিকার)-এর অধিকার আমার হবে, তবে আমি তা করব। তখন বারীরা (রাঃ) তার মালিকদের নিকট গেল এবং তাদের তা বলল। তারা তা অস্বীকার করল। বারীরা (রাঃ) তাদের নিকট থেকে (আমার কাছে) এলো। আর তখন রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে বলল আপনার কথা তাদের কাছে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য ওয়ালার অধিকার সংরক্ষণ ছাড়তে রাযী হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) তা শুনলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-কে তা সবিস্তারে জানালেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য ওয়ালার শর্ত মেনে নাও। কেননা, ওয়ালার হক তারই, যে আযাদ করে। আয়েশা (রাঃ) তাই করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ– 'লোকদের কী হ'ল যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে, যা মহান আল্লাহ তা'আলার বিধানে নেই। মহান আল্লাহ তা'আলার বিধানে যে শর্তের উল্লেখ নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে, শত শর্ত হলেও। মহান আল্লাহ তা'আলার ফায়সালাই সঠিক, মহান আল্লাহ তা'আলার শর্তই সুদৃঢ়। ওয়ালার হক তো তারই, যে আযাদ করে'।[১]

২. বাদী-বিবাদী উভয় সন্তুষ্টি থাকা :

ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ قَالَ بَيِّنَتُكَ قَالَ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ. قَالَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ يَمِينُهُ قَالَ إِذًا يَذْهَبُ بِهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَاكَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে দু'ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে একটি ভূমি সম্পর্কে বিচার প্রার্থনা করে। তন্মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! জাহিলিয়্যাত যুগে এ ব্যক্তি আমার ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, বিচার প্রার্থনাকারী ছিল ইমরাউল কায়স ইবনু আবিস আল কিনদী আর তার বিবাদী ছিল রাবী'আ ইবনু আবদান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার সাক্ষী পেশ কর। লোকটি বলল, আমার কোন সাক্ষী নাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহলে বিবাদী থেকে কসম নেয়া হবে। লোকটি বলল, তবে তো সে মিথ্যা কসম করে সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার কাছ থেকে তোমার এতটুকু প্রাপ্য। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বাদী যখন শপথ করার জন্য প্রস্তুত হ'ল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে

১. *বুখারী হা/২১৬৮।*

সম্পত্তি গ্রাস করবে, সে আল্লাহ্র কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন'।[২]

৩. বিবাদীর উপর শারঈ নির্দেশনা দেওয়া :

বর্তমান সময়ে বিচার ব্যবস্থা একদম ভঙ্গুর। শারঈ মানদণ্ডে বিচারকার্য না চলার কারণে বিনা দোষে আজ হাযারো মানুষ কারাভোগ করছে। কখনও বা দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। কিন্তু ব্যক্তি তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করবে। এতে কারো সুফারিশে শাস্তি কম-বেশী হবে না। হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ، فَقَالَ وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا– আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, মাখযূম গোত্রের জনৈক চোর মহিলার ঘটনা কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুললো। এ অবস্থায় তারা (পরস্পর) বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে কে আলাপ আলোচনা (সুফারিশ) করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর প্রিয়তম ব্যক্তি ওসামা ইবনু যায়িদ (রাঃ) এ জটিল ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। (নবীজীর খেদমতে তাঁকে পাঠানো হ'লে তিনি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে) ক্ষমা করে দেয়ার সুফারিশ করলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি কি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লংঘনকারিণীর সাজা (হাত কাটা) মওকুফের সুফারিশ করছ? তারপর নবী (ছাঃ) দাঁড়িয়ে খুত্বায় বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি সমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অপরদিকে যখন কোন সহায়হীন দরিদ্র সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার উপর হদ (হাতকাটা দণ্ডবিধি) প্রয়োগ করত। আল্লাহ্র কসম, যদি মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতিমা চুরি করত তবে আমি তার হাত অবশ্যই কেটে ফেলতাম'।[৩]

৪. বাদী-বিবাদীর উপর যুলুম না হওয়া :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِىَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ– উম্মে সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা আমার কাছে বিবাদী মীমাংসার জন্য এসে থাক। তোমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষ হ'তে দলীল প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারে অধিকতর পারদর্শী হ'তে পারে। ফলে আমি আমার শোনা মতে যদি কাউকে তা অন্য ভাইয়ের হক দিয়ে দেই, তাহলে যেন সে তা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তার জন্য জাহান্নামের একটা অংশই পৃথক করে দিচ্ছি'।[৪]

অপর এক হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ– আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে জালিম হোক অথবা মজলুম হোক। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মজলুম হ'লে তাকে সাহায্য করব, তা তো বোধ্যগম্য ব্যাপার। কিন্তু জালিম হ'লে তাকে সাহায্য করব, তা কিভাবে? তিনি বললেন, তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখবে। আর এটাই হচ্ছে তার সাহায্য'।[৫]

মীমাংসার প্রকারভেদ :

১. মুসলমান ও কাফের ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা :

মিছওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, আমর ইবনু আউফ আনসারী (রাঃ) যিনি আমির ইবনু লুয়াইয়ের মিত্র ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন, তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু উবাইদা ইবনু জাররাহ (রাঃ)-কে বাহরাইনে জিযিয়া আদায় করার জন্য পাঠালেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং 'আলা ইবনু হাযরামী (রাঃ)-কে তাদের আমির নিযুক্ত করেছিলেন'।[৬]

২. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মীমাংসা :

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা ও সহানুভূতি তৈরী হয় *(রূম /২১)*। অপর দিকে শয়তানের নিকট অধিক প্রিয় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো *(মুসলিম ২৮১৩)*। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মীমাংসা হওয়া খুবই যরূরী। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

২. *মুসলিম হা/১৩৯।*
৩. *বুখারী হা/৩৪৭৫ ।*
৪. *বুখারী হা/৬৯৬৭ ।*
৫. *বুখারী হা/৬৯৫২।*
৬. *বুখারী হা/৬৪২৫।*

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ‘আর যদি তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহ’লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে মীমাংসা চায়, তাহ’লে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে (সম্প্রীতির) তাওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও ভিতর-বাহির সবকিছু অবহিত’ *(নিসা ৪/৩৫)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا যদি কোন স্ত্রী তার স্বামী থেকে দূরত্ব ও উপেক্ষার আশংকা করে, তাহ’লে তারা পরস্পরে কোন সমঝোতায় উপনীত হলে, তাতে কোন দোষ নেই। আর মীমাংসাই উত্তম। (কেননা) অন্তর সমূহে লোভ বিদ্যমান থাকে (যা পরস্পরকে সন্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে)। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং সংযমী হও, তবে তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত’ *(নিসা ৪/১২৮)*।

হাদীছে এসেছে, সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী (রাঃ)-এর কাছে ‘আবু তুরাব’-এর চাইতে প্রিয়তর কোন নাম ছিল না। এ নামে ডাকা হলে তিনি অত্যন্ত খুশী হ’তেন। কারণ একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-এর ঘরে আসলেন। তখন আলী (রাঃ)-কে ঘরে পেলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার চাচাতো ভাই কোথায়? তিনি বললেন, আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু ঘটায় তিনি আমার সঙ্গে রাগারাগি করে বের হয়ে গেছেন। আমার কাছে কায়লুলা করেন নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেনঃ দেখতো সে কোথায়? সে লোকটি এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি তো মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে দেখতে পেলেন যে, তিনি কাত হয়ে শুয়ে আছেন, আর তাঁর চাদরখানা পাশ থেকে পড়ে গেছে। ফলে তাঁর সাথে মাটি লেগে আছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর গায়ের মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, উঠো, আবু তুরাব (মাটির বাবা) উঠো, আবু তুরাব! একথাটা তিনি দু’বার বললেন।[৭]

৩. সীমালংঘনকারী ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ’লে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালংঘন করে, তাহ’লে তোমরা ঐ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে দল সীমালংঘন করে। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের (সন্ধির) দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তাহ’লে তোমরা উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালবাসেন’ *(হুজুরাত ৪৯/৯)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفِى حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ন্যায়পরায়ণ শাসক মহান আল্লাহ্র নিকট নূরের উচ্চ মিনারায় অবস্থান করবে, যা থাকবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র ডান পাশে। তবে আল্লাহ্র (কুদরতের) উভয় হাতেই ডান দিক। যেসব শাসক ন্যায়-ইনসাফ ও সততার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করবে, নিজেদের পরিজনদের সাথে ইনসাফ করবে এবং তাদের উপর ন্যস্ত প্রতিটি দায়িত্বের ক্ষেত্রে ন্যায়ের পরিচয় দেবে-কেবল তারাই এই মার্যাদার অধিকারী হবে’।[৮]

অপর হাদীছে এসেছে, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা উপস্থিত ছিলাম। জনৈক মুহাজির এক আনছারের পশ্চাদদেশে লাথি মারেন। তখন আনছারী ছাহাবী ‘হে আনছারী ভাইয়েরা! এবং মুহাজির ছাহাবী ‘হে মুহাজির ভাইয়েরা! বলে ডাক দিলেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) শুনে বললেন, এ কি ধরণের ডাকাডাকি? তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, এক মুহাজির এক আনছারীর পাছায় লাথি মেরেছে। আনছারী হে আনছারী ভাইয়েরা! এবং মুহাজির ছাহাবী হে মুহাজির ভাইয়েরা! বলে নিজ নিজ গোত্রকে ডাক দিলেন। এ কথা শুনে নবী (ছাঃ) বললেন, বাদ দাও, এটি খুবই বাজে কথা। নবী (ছাঃ) যখন মদিনায় হিজরত করে আসেন তখন আনছাররা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। অবশ্য পরে মুহাজিররা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যান। এরপর ঘটনাটি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর কানে পৌঁছল। সে বলল, সত্যিই তারা কি এ কাজ করেছে? আল্লাহ্র কসম! আমরা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে সবল লোকেরা দুর্বলদের বহিষ্কার করবেই। তখন উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এখনই এ মুনাফিকের শিরচ্ছেদ করি। নবী (ছাঃ) বললেন, উমার! তাকে ছেড়ে দাও, যেন কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর সাথীদের হত্যা করছেন’।[৯]

৭. *বুখারী হা/৪৪১; মুসলিম হা/২৪০৯।*

৮. *মুসলিম হা/১৮২৭।*
৯. *বুখারী হা/৪৯০৭।*

৪. দু'জন দেনা-পাওনাদারের মাঝে মীমাংসা :

হাদীছে এসেছে, কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় একবার তিনি ইবনু আবু হাদরাদের কাছে মসজিদে পাওনা আদায়ে তাগাদা করলেন, এতে উভয়ের আওয়াজ চড়ে গেল। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ঘর থেকেই আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘরের পর্দা সরিয়ে তাদের কাছে এলেন আর কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ)-কে ডাকলেন এবং বললেন, হে কা'ব! কা'ব (রাঃ) বললেন, আমি হাযির হে আল্লাহ্র রাসূল! রাবী বলেন, তিনি হাতে ইশারা করলেন, অর্ধেক মওকুফ করে দাও। কা'ব (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাই করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনে আবু হাদরাদকে) বললেন, 'যাও, তার ঋণ পরিশোধ করে দাও'।[১০]

মীমাংসার ফযীলত :

১. মীমাংসা উত্তম কাজ :

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চলতে গিয়ে কখনও যদি নিজেদের মাঝে মনমালিন্য হয় সে ক্ষেত্রে আপোষে মীমাংসা করে নেওয়া খুবই যরূরী। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ 'আর মীমাংসাই উত্তম' *(নিসা ৪/১২৮)*।

২. আল্লাহ্র নিকট মীমাংসাকারীর উত্তম প্রতিদান :

মহান আল্লাহ বলেন, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 'তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই। কিন্তু যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাক্বা করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব' *(নিসা ৪/১১৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কোন ব্যক্তি প্রয়োজন নিয়ে এলে তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলতেন, তোমরা এর জন্য সুফারিশ কর, তাহ'লে ছওয়াব পাবে। আর আল্লাহ তার নবীর মুখে এমন সমাধান দেন যা তিনি পছন্দ করেন'।[১১]

৩. মীমাংসা করা ছাদাক্বা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِى دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ– 'প্রত্যেক দিন যখন সূর্য উদিত হয়, তখন মানুষের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কর জন্য ছাদাক্বা ওয়াজিব। তিনি বলেন, দু-ব্যক্তির মাঝে ন্যায়বিচার করা ছাদাক্বা, কোন ব্যক্তিকে তার সাওয়ারীর ব্যাপারে সাহায্য করা। অথবা তার মাল সামগ্রী তুলে দেয়া ছাদাক্বা। তিনি আরও বলেছেন, ভাল কথা বলা ছাদাক্বা, ছালাতের উদ্দেশ্যে গমনের পথে প্রতিটি পদক্ষেপ ছাদাক্বা। চলার পথ হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া ছাদাক্বা'।[১২]

৪. মীমাংসা করা দেওয়া মহৎ ইবাদত :

আবূ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ– আমি কি তোমাদের ছালাত, ছিয়াম এবং যাকাত হ'তে উত্তম আমল সম্পর্কে অবহিত করবো না? ছাহাবীগণ বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলেন, তা হ'ল পরস্পরের মাঝে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়া। কেননা, পরস্পরের মধ্যেকার ঝগড়া-বিবাদ লোকদের ধ্বংস করে দেয়'।[১৩]

অপর হাদীছে এসেছে, আবুদ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (নফল) ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বা অপেক্ষাও উত্তম আমলের কথা তোমাদের বলব কি? ছাহাবীগণ বললেন অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা পরস্পর সম্পর্ক বিনষ্ট করা হ'ল দ্বীন বিধ্বংসী বিষয়'।[১৪]

মীমাংসার বৈশিষ্ট্য :

১. পরামর্শ ভিত্তিক :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى

১০. *বুখারী হা/২৭১০।*
১১. বুখারী হা/৬০২৬; মুসলিম হা/২৬২৭।।
১২. *মুসলিম হা/১০০৯।*
১৩. *আবু দাঊদ হা/৪৯১৯।*
১৪. *তিরমিযী হা/২৫০৯।*

يَصْطَلِحَا প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক স্থাপন করে না। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। এরপর বলা হবে, এই দু'জনকে আপোষ রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু'জনকে আপোষ রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু'জনকে আপোষ রফার জন্য অবকাশ দাও'।[১৫]

২. ঈমানী ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত নয়। অতএব তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থাকে। কারণ অনুমান বড় মিথ্যা ব্যাপার। আর কারো দোষ অনুসন্ধান করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, একে অন্যকে ধোকা দিও না, আর পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করো না। বরং সবাই আল্লাহ্র বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো'।[১৬]

৩. মীমাংসার নিমিত্তে কিছু মিথ্যা কথা বলা :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللاَّتِى بَايَعْنَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِى خَيْرًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِى شَىْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلاَّ فِى ثَلاَثٍ الْحَرْبُ وَالإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا–

উম্মু কুলসূম বিনত উকবা ইবনু মূঈত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মাঝে আপোষ মীমাংসা করে দেয়। সে কল্যাণের জন্যই বলে এবং কল্যাণের জন্যই চোগলখুরী করে। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন বলে আমি শুনিনি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে, লোকদের মাঝে আপোষ-মীমাংসার জন্য, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কথার ও স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কথা প্রসঙ্গে'।[১৭]

৪. বিতর্ক এড়িয়ে চলা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِى التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আরব ভূখণ্ডে মুসল্লীগণ শয়তানের উপাসনা করবে, এ বিষয়ে শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে। তবে তাদের এক জনকে অন্যের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দেয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি'।[১৮]

অপর হাদীছে এসেছে জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ قَالَ الأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ ইবলীস পানির উপর তার আরশ স্থাপন করতঃ তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত সেই যে সর্বাধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। সে বলে, তুমি কিছুই করনি। অতঃপর অন্যজন এসে বলে, অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি। এমনকি তার থেকে তার স্ত্রীকে তালাক করে দিয়েছি। অতঃপর শয়তান তাকে তার নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে হ্যাঁ, তুমি একটি বড় কাজ করেছ। বর্ণনাকারী আমাশ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেনঃ অতঃপর শয়তান তাকে তার বুকের সাথে জড়িয়ে নেয়'।[১৯]

উপসংহার : দ্বন্দ্ব মুখর দুনিয়ায় নানামুখী সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান। ইসলাম সমস্যা ও সমাধানের অনুপম মীমাংসা ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হওয়ায় মানবতা খুঁজে পায় তার যাবতীয় মীমাংসার কাংঙ্খিত মনযিল-মাক্বছাদ। ফলে ইনছাফভিত্তিক ইসলামই হতে পারে যুলুম থেকে মানবতার মুক্তির একমাত্র প্লাটফর্ম।

১৫. *মুসলিম হা/২৫৬৫।*
১৬. *বুখারী হা/৬০৬৪।*
১৭. *মুসলিম হা/২৬০৫।*
১৮. *মুসলিম হা/২৮১২।*
১৯. *মুসলিম হা/২৮১৩।*

মুসলিম ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ

-ওমর ফারূক

নিশ্চয় মুসলিম সমাজ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে একটি সম্পর্কের ভিত্তিতে। আর সেই সম্পর্কটি রক্ত বা বৈবাহিক কিংবা চুক্তিভিত্তিক অথবা গোত্রপ্রীতির কারণে নয়। বরং আদর্শ সমাজ বিনির্মানের মূল চালিকাশক্তি হ'ল ইসলাম ও ঈমান। মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কারণে তারা পরস্পর পরস্পরের ভাই ভাই হয়ে যায়। ফলে ভিন্ন ভিন্ন এলাকা, অঞ্চল, দেশ, গোত্র তাদের আলাদা করতে পারেনি। ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 'মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ– 'আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান' *(তওবাহ ৯/৭১)*।

সুতরাং কখনও রক্তের সম্পর্ক কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ আরো সুদৃঢ় মযবুত হয়।

রাসূল (ছাঃ) এক মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে সম্পর্কের একটি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছেন। কেননা এক জনের পক্ষে এই সম্পর্ক ধরে রাখা সম্ভব নয়। বরং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এ সম্পর্কে হাদীছ- عَنْ أَبِى مُوسَى رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ– 'আবু মুসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এক মুমিন আর এক মুমিনের জন্য ইমারত তুল্য, যার এক অংশ আর এক অংশকে সুদৃঢ় করে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর এক হাতের আঙ্গুল আর এক হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন'।[১]

ফলে সকলেই একে অপরের সম্পূরক। যার কারণ একজনের আনন্দে অপরজন আনন্দিত হয়। আবার একজনের দুঃখে অপরজন দুঃখিত হয়। একইভাবে একজনের সুখে অপরজন সুখী হয়। সাথে সাথে একজনের ব্যাথায় অপরজন ব্যথিত হয়। তাদের বংশ, গোত্র ও বর্ণ আলাদা হ'লেও মনে হয় তাদের যেন একটি আত্মার বন্ধন। আমাদের এই ভ্রাতৃত্বটি রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছটি আরো সঞ্চারিত করেছে। عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى– নুমান ইবন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তুমি মুমিনদের পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ গ্রহণ করে'।[২]

সুতরাং মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কারণে একজন মুমিনের অন্তরে অপর প্রান্তের মুমিনের প্রতিচ্ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠে। কেননা সকল মুসলমান সমান সমান। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ 'সকল মুসলিমের রক্ত সমান'।[৩]

মদীনায় ভ্রাতৃত্বের একটি দৃষ্টান্ত

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রাঃ) হিজরত করে আমাদের কাছে এলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ও সা'দ ইব্ন রাবী (রাঃ)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দিলেন। তিনি (সা'দ) (রাঃ) ছিলেন অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি। সা'দ (রাঃ) বললেন, সকল আনছারগণ জানেন যে আমি তাঁদের মধ্যে অধিক বিত্তবান ব্যক্তি। আমি অচিরেই আমার ও তোমার মাঝে আমার সম্পত্তি ভাগাভাগি করে দিব দুই ভাগে। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে; তোমার যাকে পসন্দ হয় বল, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত পালন শেষ হলে তুমি তাকে বিয়ে করে নিবে। আবদুর রাহমান (রাঃ) বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবার পরিজনের মধ্যে বরকত দান করুন। (এরপর তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন) বাজার থেকে মুনাফা স্বরূপ ঘি ও পনীর সাথে নিয়ে ফিরলেন।

অল্প কয়েকদিন পর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন। তখন তাঁর শরীরে ও কাপড়ে হলুদ রংয়ের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আমি একজন আনছারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাঁকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি বললেন, খেজুরের এক আটির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি অথবা (বলেছেন) একটি আটি পরিমান স্বর্ণ

১. *বুখারী হা/২৪৪৬, ৬০২৬; মুসলিম হা/২৫৮৫।*

২. *বুখারী হা/৬৭৫১; মুসলিম হা/২৫৮৬।*

৩. *বুখারী হা/৬৭৫১; মুসলিম হা/২৫৮৬।*

দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, একটি বকরী দিয়ে হ'লেও ওয়ালীমা কর'।[৪]

রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আবু বকরের ভ্রাতৃত্ব :

আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, (ওমর (রাঃ) তাঁকে বলেছেন) ওমর ইবন খাত্ত্বাবের কন্যা হাফসার স্বামী খুনায়স ইবন হুযাফা সাহামী (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, মদীনায় ইন্তেকাল করলে হাফসা (রাঃ) বিধবা হয়ে পড়লেন। 'ওমর (রাঃ) বলেন, তখন আমি 'ওছমান ইবন আফফানের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর নিকট হাফসার কথা আলোচনা করে তাঁকে বললাম, আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে ওমরের মেয়ে হাফসাকে বিয়ে দিয়ে দেব। ওছমান (রাঃ) বললেন, ব্যাপারটি আমি একটু চিন্তা করে দেখি। (ওমর (রাঃ) বলেন, এ কথা শুনে) আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। পরে ওছমান (রাঃ) বললেন, আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, এই সময় আমি বিয়ে করব না।

ওমর (রাঃ) বলেন, এরপর আমি আবু বকরের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনার ইচ্ছা করলে ওমরের কন্যা হাফসাকে আমি আপনার নিকট বিয়ে দিয়ে দেব। (এ কথা শুনে) আবু বকর (রাঃ) চুপ করে রইলেন এবং আমাকে কোন জবাব দিলেন না। এতে আমি ওছমানের (অস্বীকৃতির) চেয়েও অধিক দুঃখ পেলাম।

এরপর আমি কয়েকদিন চুপ করে রইলাম, এমতাবস্থায় হাফসার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)- নিজেই প্রস্তাব দিলেন। আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিয়ে দিলাম। এরপর আবু বকর (রাঃ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার সাথে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর আমি কোন উত্তর না দেওয়ার ফলে সম্ভবত আপনি মনকষ্ট পেয়েছেন। (ওমর (রাঃ) বলেন) আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, আপনার প্রস্তাবের জবাব দিতে একটি জিনিসই আমাকে বাঁধা দিয়েছে আর তা হ'ল এই যে, আমি জানতাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই হাফসা (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ করার আমার ইচ্ছা ছিল না। (এ কারণেই আমি আপনাকে কোন উত্তর দেইনি।) যদি তিনি (রাসূল ছাঃ) তাঁকে গ্রহণ না করতেন, অবশ্যই আমি তাঁকে গ্রহণ করতাম'।[৫]

ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য :

ভ্রাতৃত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'তে হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। কেননা হাদীছে এসেছে, قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ يَا أَبَا ذَرٍّ! أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمُوَالَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু যার (রাঃ)-কে বললেন, হে আবু যার! ঈমানের কোন শাখাটি অধিক মযবুত? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক অবগত। তিনি (ছাঃ) বললেন, একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর সখ্যতা স্থাপন করা এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করা'।[৬]

অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ– 'তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়। (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছুর থেকে প্রিয় হওয়া। (২) কাউকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসা। (৩) কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপছন্দ করা'।[৭]

অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ ...وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ 'যে দিন আল্লাহ্র (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবেনা সে দিন আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তন্মধ্যে একটি হ'ল সে দু' ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহ্র জন্য, একত্র হয় আল্লাহ্র জন্য এবং পৃথক হয় আল্লাহ্র জন্য'।[৮]

ভ্রাতৃত্ব রক্ষায় মুসলিমের হক্ব

ঈমানী দৃঢ়তার এক অপর দৃষ্টান্ত মুসলিম ভ্রাতৃত্ব। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা চান মুমিনরা ভ্রাতৃত্বে ও ভালবাসার মেলবন্ধনে আবদ্ধ থাকুক। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) চান মুমিনরা যেন এক দেহ এক আত্মার ন্যায় থাকে। সুতরাং এই ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক্ব রয়েছে। সেগুলোকে সংরক্ষণ করতে হবে। এ বিষয়ে হাদীছ এসেছে, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুসলমানের প্রতি মুসলমানের হক ছয়টি। জিজ্ঞাসা করা হ'ল, সেগুলো কী, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! ইরশাদ করলেন (সেগুলো হ'ল) ১. তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হ'লে তাকে সালাম দিবে। ২.

৪. *বুখারী হা/৩৭৮১।*
৫. *বুখারী হা/৪০০৫।*
৬. *শু'আবুল ঈমান হা/৯৫১৩; ছহীহাহ হা/১৭১৮; ছহীহুল জামে' হা/২৫৩৯।*
৭. *বুখারী হা/১৬; মুসলিম হা/৪৩; তিরমিযী হা/২৬২৪।*
৮. *বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।*

তোমাকে দাওয়াত করলে তা তুমি গ্রহণ করবে। ৩. সে তোমার কাছে সৎ পরামর্শ চাইলে, তুমি তাকে সৎ পরামর্শ দিবে। ৪. সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে, তার জন্য তুমি (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে) রহমতের দো'আ করবে। ৫. সে অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে এবং ৬. সে মারা গেলে তার (জানাযার) সঙ্গে যাবে'।[৯]

আলোচ্য হাদীছে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এক মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য তার অন্তরে ভালবাসার জায়গা, পরস্পরের প্রতি দয়া, কারো কষ্টের সময় সহযোগিতাসহ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে তা সুনিপুণভাবেই অলংকৃত করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

১. সালাম বিনিময় :

মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রথম দৃষ্টান্ত হ'ল পরস্পর সাক্ষাৎ হ'লে হাসিমুখে সালাম বিনিময় করা। অর্থাৎ একজন অপরজনের সাথে সাক্ষাৎ হলেই পরস্পরের কল্যাণ কামনা করা এমন উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অন্য কোন ধর্ম বা সংস্কৃতিতে আছে বলে আমাদের জানা নেই। সুতরাং সালাম হ'ল সর্বোত্তম সম্ভাষণ, যাতে পরস্পরের মাঝে নিরাপত্তা, শান্তি ও অন্তরের তুষ্টি অর্জিত হয়। সুতরাং মুসলিম সমাজে সালামের প্রচলন ঘটালে নিজেদের জীবন, পরিবার ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তা লাভ হবে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَفْشُوا السَّلاَمَ تَسْلَمُوا তোমরা সালামের বহুল প্রচলন করো, শান্তিতে থাকতে পারবে'।[১০]

ইসলামী শারঈ মানদণ্ডে সালামের প্রসার একটি মহৎ কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ– 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন কাজটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাবার খাওয়াবে ও পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে'।[১১]

যার মধ্যে ঈমান ও ইসলামের চিহ্ন পাওয়া যায়; সে পরিচিত হোক বা অপরিচিত তাকে সালাম দিতে হবে। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক মযবুত ও সুদৃঢ় হবে। আর সে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় ও নৈকট্যশীল হবে। কেননা সে একনিষ্ঠ চিত্তে সালাম বিনিময় করে। আর সে অপরের সালামের অপেক্ষা করেনি কিংবা এতে তার কোন মজুরীও নেই। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ- عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ– আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ্র কাছে সে ব্যক্তি শ্রেয়, যে আগে সালাম দেয়'।[১২]

সালাম মুসলিম সমাজে দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে মেলবন্ধন হিসাবে কাজ করে। এতে ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর সাথে সাথে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত জান্নাত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا.أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ– 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আন আর তোমরা ঈমানদার হ'তে পারবে না যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বলে দেব না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হবে? তা হ'ল, তোমরা পরস্পর বেশী সালাম বিনিময় করবে'।[১৩]

সালাম দিয়ে কথা আরম্ভ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। তাতে উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। ছেড়ে দেওয়ার কোন ওযর নেই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا 'আর যখন তোমরা সম্ভাষণ প্রাপ্ত হও, তখন তার চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ প্রদান কর অথবা ওটাই প্রত্যুত্তর কর' *(নিসা ৪/৮৬)*।

মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে ও নিজেকে নিরহংকার রাখতে আগে সালাম দেওয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ 'কোন ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছেদ করে থাকা বৈধ নয়। (সম্পর্ক ছেদের চিহ্ন স্বরূপ) তাদের দু'জনের সাক্ষাত হ'লে দু'জনই মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের দু'জনের মধ্যে সে-ই উত্তম হবে, যে প্রথমে তার সঙ্গীকে সালাম দিবে'।

সালাম বিনিময়ের নেকী সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلاَثُونَ– ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে

৯. আবু দাঊদ হা/২৭২৫; ইবনু মাজাহ হা/২৬৮৩; মিশকাত হা/৩৪৭৫।
১০. আদাবুল মুফরাদ হা/৯৭৯; আহমাদ হা/১৮৫৫৩।
১১. বুখারী হা/১২,২৮; মুসলিম হা/৩৯।
১২. আবু দাঊদ হা/৫১৯৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৮২।
১৩. মুসলিম হা/৯৩; আবু দাঊদ হা/৫১৯৩; ইবনু মাজাহ হা/৬৮।

বলল, আসসালামু আলাইকুম। নবী করীম (ছাঃ) তার সালামের জবাব দিলে সে ব্যক্তি বসে পড়ে। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, সে দশটি নেকী পেয়েছে। এরপর এক ব্যক্তি এসে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। তিনি তার সালামের জবাব দিলে সে ব্যক্তি বসে পড়ে। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, সে বিশটি নেকী পেয়েছে। এরপর এক ব্যক্তি এসে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়াবারকাতুহু। নবী করীম (ছাঃ) তার সালামের জবাব দিলে সে বসে পড়ে। তখন তিনি বলেন, সে ত্রিশটি নেকী পেয়েছে'।[১৪]

সুতরাং পরস্পর সালাম বিনিময় যেমন পুণ্যের তেমনি এর দ্বারা সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ বহু গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

২. দাওয়াত গ্রহণ :

মুসলিম সমাজে অধিকাংশ ওয়ালীমা বা ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয় বিবাহ উপলক্ষে বা কোন সাফল্য অর্জিত হলে কিংবা সন্তান ভূমিষ্ট হলে। এছাড়াও অন্যান্য কারণেও ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বভাবসূলভ বৈশিষ্ট্য হ'ল মুসলমানরা তাদের এই অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীসহ সহপাঠী ও সহকর্মীদের দাওয়াত করে থাকে। তখন উচিত হবে আনন্দচিত্তে তা গ্রহণ করা। তার বাড়ীতে যাওয়া ও তার পরিবেশিত খাবার গ্রহণ করা। এতে করে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব ও আন্তরিকতা উভয়ের মাঝে বৃদ্ধি পাবে।

রাসূল (ছাঃ) একে অপরের দাওয়াত গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করাকে নিন্দা করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا– হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কাউকে ওয়ালীমার দাওয়াত করলে তা অবশ্যই গ্রহণ করবে'।[১৫]

ইবন উমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ– নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার ভাইকে দাওয়াত দেয় সে যেন তার দাওয়াতে সাড়া দেয়, বিয়ে অনুষ্ঠানই হউক বা সে রকম অন্য কোন অনুষ্ঠান'।[১৬]

জাবির (রাঃ) হ'ত বর্ণিত, তিনি আরো বলেনর إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কাউকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন দাওয়াতে সাড়া দেয়। তারপর ইচ্ছা করলে আহার করবে, না হয় না করবে'।[১৭]

অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ 'যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে ছায়েম হয় তাহ'লে সে (দাওয়াতদাতার) জন্য দো'আ করে। আর যদি ছায়েম না হয় তাহ'লে সে যেন খায়'।[১৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ– নিকৃষ্টতম খাদ্য হ'ল ওলীমার খাদ্য যেখানে আগমনকারীদের বাঁধা দেওয়া হয়। আর অনিচ্ছুকদের দাওয়াত দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াতে সাড়া দেয় না সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নাফরমানী করল'।[১৯]

দাওয়াত গ্রহণের দ্বারা সম্পর্ক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিনা কারণে দাওয়াত গ্রহণ না করলে আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন। এটা হ'ল দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা পরস্পরে হিংসা পোষণ করবে না, পরস্পর ধোঁকাবাজি করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না একে অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে পশ্চাতে শত্রুতা করো না এবং একের বেচাকেনার উপর অন্যে বেচাকেনার চেষ্টা করবে না। তোমরা আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে থাক। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং হেয় করবে না। তাক্বওয়া এইখানে, এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার তার সীনার প্রতি ইশারা করলেন। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হেয় করে। কোন মুসলমানের উপর প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল ও ইযযত-আবরু হারাম'।[২০] *(চলবে)*

[লেখক : আলিম দ্বিতীয় বর্ষ, তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা, টঙ্গী শাখা, ঢাকা]

---

১৪. আবু দাউদ হা/৫১৯৫; তিরমিযী হা/৩৩১১; মিশকাত হা/৪৬৪৪।
১৫. বুখারী হা/৫১৭৩; মুসলিম হা/১৪২৯; মিশকাত হা/৩২১৬।
১৬. মুসলিম হা/১৪২৯; আবু দাউদ হা/৩৭৩৮; আহমাদ হা/৬৩৩৭।
১৭. মুসলিম হা/১৪৩০; আবু দাউদ হা/৩৭৪০; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫১।
১৮. মুসলিম হা/১৪৩১; আবু দাউদ হা/২৪৬১; তিরমিযী হা/৭৮১।
১৯. মুসলিম হা/১৪৩২; বুখারী হা/৫১৭৭; মিশকাত হা/৩২১৮।
২০. মুসলিম হা/২৫৬৪; আহমাদ হা/৭৭১৩।

কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়তর

-মিনারুল ইসলাম

ভূমিকা : জান্নাত পিয়াসী মুমিনের চাই মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর তা অর্জিত হ'তে পারে নেক আমল অনুশীলনের মাধ্যমে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে নৈকট্যের চাদরের জড়িয়ে নেন, যখন সে নিজেকে তাঁর প্রদত্ত প্রিয়তর আমল দ্বারা নিজেকে প্রমাণ করতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র নিকট অধিকতর প্রিয় তা নিম্নে পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হ'ল।

১. মুহসিন বা সৎকর্মশীল :

হাসানাহ, ইহসান এবং মুহসিন শব্দত্রয় একে অপরে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহসান শব্দের শাব্দিক অর্থ হ'ল দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা, সততা ইত্যাদি। ইহসান হ'ল আবশ্যিক বিষয়গুলো আদায় করা এবং নিষেধকৃত বস্তু পরিত্যাগ করা, কল্যাণকর কাজে প্রচেষ্টা চালানো, গরীবদের বেশী বেশী দান করা, দুঃখীদের পাশে দাঁড়ানো, রোগীর শুশ্রূষা করা, যালেমকে প্রতিহত করা এবং মাযলূমকে সাহায্য করা, হাঁচির জবাব দেয়া, সালামের জবাব দেয়া, ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের প্রতিরোধ, আল্লাহ্র পথে দাওয়াত এবং মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দেয়া। সর্বোপরি মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা।

ইহসান হ'ল প্রতিটি কর্মে রবকে হাযির-নাযির জানা এবং সবকিছু তার দৃষ্টিগোচরে আছে বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস রেখে কর্মে লেগে থাকা। রাসূল (ছাঃ) ইহসানের ব্যাখ্যায় বলেন, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'তুমি আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ। যদি দেখতে না পাও, তাহ'লে বিশ্বাস কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন'।[১]

আল্লাহ ও তদীয় রাসূল আমাদেরকে ইহসান করতে আদেশ করেছেন। মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও নৈকট্য হাসিলের জন্য পরস্পরে হাসানাহ বা কল্যাণময় কাজের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করা উচিৎ। একজন মুমিন আল্লাহ্র প্রিয়তর বান্দাতে পরিণত হ'তে এবং তার ভালবাসা পেতে মুহসিন হওয়ার বিকল্প নেই। আর মুহসিন হ'তে গেলে আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিলের জন্য ইবাদতে মনোনিবেশ করা, তার শাস্তি কে ভয় করা, তাক্বওয়া অবলম্বন করা এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকা প্রয়োজন।

বস্তুতঃ যাবতীয় শ্রুতি ও রিয়া তথা লোক দেখানো ও সুনাম কুড়ানো আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে প্রতিটি ক্ষণই হওয়া চাই মুমিন-মুহিসীনদের একমাত্র কাম্য।

যে সৎকর্ম করে, সে নিজের ভালোর জন্যেই তা করে। আর যে অপকর্ম করে, তার প্রতিফলও সে-ই ভোগ করবে। কেউ যদি গোপনে দান-খয়রাত, মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর করে শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দেয়, তবেই তা সৎকাজ। এই জীবনে যারা সৎকর্মশীল তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির সেরা ঘোষণা করেছেন। কুরআনে মুহসিনদের সৎকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

'প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পৃথক ক্বিবলা, যেদিকে তারা উপাসনাকালে মুখ করে থাকে। কাজেই দ্রুত সৎকর্ম সমূহের দিকে এগিয়ে যাও (অর্থাৎ কা'বামুখী হও)। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান' *(বাক্বারাহ ২/১৪৮)*।

তিনি আরো বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*।

'অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় পুরস্কার দান করলেন ও সেই সাথে রয়েছে আখেরাতের সুন্দর পুরস্কার। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৪৮)*।

'তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই। কিন্তু যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাক্বা করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব' *(নিসা ৪/১১৪)*।

'কোন জনপদ ধ্বংস করার আগে আমি সেখানকার বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকদের সৎকর্ম করার নির্দেশ দেই। কিন্তু ওরা আমার আদেশের অবাধ্য হয়ে অন্যায় ও যুলুমে লিপ্ত হয়। তখন ন্যায়সঙ্গতভাবেই আযাবের ফয়ছালা হয়ে যায় এবং তারা ধ্বংস হয়' *(বনী ইস্রাঈল ১৭/১৬)*।

'যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন। আর স্থায়ী সৎকর্ম সমূহ তোমার পালনকর্তার নিকটে পুরস্কারের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ' *(মারিয়াম ১৯/৭৬)*।

'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে অসৎ কর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন' *(হা-মীম-সাজদাহ ৪১/৪৬)*।

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তারাই হ'ল সৃষ্টির সেরা' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৭)*।

১. মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।

মহান আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إن الله مُحسن يحبُ الإحسان 'আল্লাহ মুহসিন বা দয়ালু, তিনি ইহসান করাকে ভালবাসেন'।[২]

সৎকর্মশীলদের বৈশিষ্ট্য :

মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও মন্দকাজে নিষেধ করে এবং কল্যাণকর্ম সমূহের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। আর তারা হ'ল সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত' *(আলে-ইমরান ৩/১১৪)*।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. আবু শুরাইহ আল-খুযাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়াপরবশ হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে সেন তার মেহমানের সমাদর করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অন্যথায় নীরব থাকে'।[৩]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত। যারা তাদের পালনকর্তার আয়াত সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করে না। আর যারা তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে (আল্লাহ্র পথে) দান করে এজন্য যে, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে। এরাই দ্রুত কল্যাণ কাজে ধাবিত হয় এবং তারা তার প্রতি অগ্রগামী হয়' *(মুমিনূন ২১/৫৭-৬১)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'এগুলি প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত। সৎকর্মশীলদের জন্য পথ নির্দেশক ও রহমত স্বরূপ। যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। এরাই তাদের প্রতিপালকের প্রদর্শিত পথে আছে এবং এরাই সফলকাম' *(লোকমান ৩১/২-৫)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান (যথাসাধ্য সুন্দর রূপে সম্পাদন করা) অত্যাবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কোন প্রাণীকে) হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে; আর যখন যবেহ করবে তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং তার যবেহকৃত জন্তুকে শাস্তি প্রদান না করে (অহেতুক কষ্ট না দেয়)'।[৪]

আল্লাহ আমাদেরকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সুস্থতা ও অর্থ দিয়েছেন। যদি এগুলোকে সৎকর্মে বিনিয়োগ করি, তবে আল্লাহর পুরস্কার অবধারিত।

সৎকর্মশীলদের পুরস্কার :

মহান আল্লাহ বলেন, 'পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দাও। যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়। যখন তাদেরকে সেখানে খাদ্য হিসাবে কোন ফল প্রদান করা হবে, তখন বলবে, এটা তো সেইরূপ খাদ্য, যা আমাদেরকে ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছিল। এভাবে তাদেরকে দেওয়া হবে সামঞ্জস্যশীল খাদ্য। এছাড়া তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল' *(বাক্বারাহ ২/২৫)*।

তিনি আরো বলেন, 'পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাসী হয়েছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের প্রাপ্য পূর্ণভাবে দেওয়া হবে। আর আল্লাহ অত্যাচারীদের ভালবাসেন না' *(আলে-ইমরান ৩/৫৭)*।

'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন' *(মায়েদাহ ৫/৯)*।

'আর আমরা তাকে (ইবরাহীমকে) দান করেছিলাম (সন্তান হিসাবে) ইসহাক ও ইয়াকূবকে। তাদের প্রত্যেককে আমরা হেদায়াত দান করেছিলাম। ইতিপূর্বে নূহকেও আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম। (একইভাবে সরল পথ প্রদর্শন করেছি) তার (অর্থাৎ ইবরাহীমের) সন্তানদের মধ্যে দাঊদ, সুলায়মান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি' *(আন'আম ৬/৮৪)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রহমত সৎকর্মশীলদের অতীব নিকটবর্তী'

রাসূল (ছাঃ) বলেন, أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلٌ يشكو قسوةَ قلبه قال : أتُحبُّ أن يلينَ قلبُك وتدركَ حاجتَك؟ ارحَمِ اليتيمَ امسحْ رأسَه وأطعِمْه من طعامِك يلِنْ قلبُك وتدركْ حاجتَك 'একজন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট তার অন্তরের কঠোরতার ব্যাপারে অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তুমি কি নরম অন্তর ও তোমার প্রয়োজন মিটাতে পসন্দ কর? তাহলে ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর; তার মাথায় হাত বুলায়; তোমার খাবার থেকে তাকে

২. *ছহীহুল জামে' হা/১৮২৪।*
৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৩।*
৪. *মুসলিম, তিরমিযী মিশকাত হা/৪০৭৩।*

খাওয়াও। তবেই তোমার অন্তর নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন মিটবে'।[৫]

২. মুত্তাক্বী বা পরহেযগার :

একজন প্রেমার্থীর মূল লক্ষ্য থাকে তার প্রেমাস্পদের মন জয় করা। স্বভাবগতভাবেই মানুষ তার প্রিয় ব্যক্তির পসন্দ-অপসন্দ জেনে সে অনুযায়ী তার মন জয় করার চেষ্টা করে। প্রতিটি মুমিনেরও লক্ষ্য তাঁর স্রষ্টা মহান রাব্বুল 'আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করা। একজন মুমিনের সার্থকতা তার প্রভুর সন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত থাকে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সবচেয়ে বড় কাজ হল তাক্বওয়া অর্জন তথা মুত্তাক্বী হওয়া। মুত্তাক্বী শব্দটি তাক্বওয়া থেকে নির্গত যার অর্থ হ'ল বাঁচা বা বেঁচে থাকা। শাব্দিক অর্থে ভয়। তাক্বওয়াল্লাহ হ'ল আল্লাহ ভীতি বা ভয়। আল্লাহ্র আদেশসমূহ মান্য করা এবং তার যাবতীয় নিষেধসমূহ থেকে নিজেকে পরহেয করা। এজন্য তাক্বওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিকে মুত্তক্বী বা পরহেযগার বলা হয়। তাক্বওয়া ব্যাখ্যায় সালাফরা বলেন, إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأل أبيّ بن كعب عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقًا ذا شوك؟ قال: بلى قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، قال: فذلك التقوى–'ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একবার হযরত কা'ব (রাঃ)-কে তাক্বওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি কখনও কণ্টকময় পথে হেঁটেছেন? ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন হ্যাঁ, তিনি বললেন, তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সেই পথ কিভাবে পার হন? ইবনে ওমর (রাঃ) উত্তরে বললেন, যে তিনি খুব সন্তর্পনে নিজের কাপড় গুটিয়ে সেই রাস্তা পার হন যেন কোনভাবেই কাঁটার আঘাতে কাপড় ছিঁড়ে না যায় অথবা শরীরে না বিঁধে। কা'ব (রাঃ) উত্তরে বললেন যে, এটাই হ'ল তাক্বওয়া'।[৬]

মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্য :

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

'এই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক। যারা গায়েবে বিশ্বাস করে ও ছালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রূযী দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ঐ বিষয়ে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্ববর্তীগণের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল। আর পরকালীন জীবনের প্রতি যারা নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে। ঐসকল মানুষ তাদের প্রতিপালকের দেখানো পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই হ'ল সফলকাম' *(বাক্বারাহ ২/১-৫)*।

'অতঃপর আমরা এ ঘটনাকে সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ হিসাবে সাব্যস্ত' *(বাক্বারাহ ২/৬৬)*।

'হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও নারী থেকে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তোমাদের ভিতর-বাহির সবকিছু অবগত' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

'(ইবাদত কালে) পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোটাই কেবল সৎকর্ম নয়, বরং প্রকৃত সৎকর্মশীল ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ, বিচার দিবস, ফেরেশতামণ্ডলী, আল্লাহ্র কিতাব ও নবীগণের উপর এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, প্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্য। আর যে ব্যক্তি ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে এবং অভাবে, রোগ-পীড়ায় ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যের সাথে দৃঢ় থাকে। তারাই হ'ল সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই হ'ল প্রকৃত আল্লাহভীরু' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*।

'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য। যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর স্বীয় পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কে আছে? আর যারা জেনেশুনে স্বীয় কৃতকর্মের উপর হঠকারিতা প্রদর্শন করে না। ঐসব লোকদের জন্য প্রতিদান হ'ল তাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে ক্ষমা ও জান্নাত। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। সৎকর্মশীলদের জন্য কতইনা সুন্দর প্রতিদান! *(আলে ইমরান ৩/১৩৩-১৩৬)*।

তাক্বওয়া হ'ল মানুষের মনের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা আল্লাহ ভীতি। মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতে মুমিন, মুত্তাক্বীগণকে পুরুস্কৃত করবেন। সেখানে মহান আল্লাহ তার অন্তরের সেই তাক্বওয়ানুযায়ী জান্নাতের স্তর নির্ধারণ করবেন। আল্লাহ মুত্তাক্বীগণকে ভালবাসেন *(তাওবাহ ৯/৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ. 'আল্লাহ তোমাদের শরীর, চেহারা দেখবেন না। বরং তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তর'।[৭]

(চলবে)

[লেখক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

---

৫. ছহীহুল জামে' হা/৮০।

৬. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/১৬৪ পৃ. (দ্র. বাক্বারাহ ২/৩)।

৭. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৫৩১৪।

যুগে যুগে ইমাম মাহদী দাবীদারগণ

-আব্দুর রউফ

ইমাম মাহদী (আঃ)-কে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার কোন অন্ত নেই। ইদানীংকালে ওয়ায মাহফিলে ইমাম মাহদীকে নিয়ে চমকপ্রদ বক্তৃতা দিয়ে আলোচনায় আসছেন বক্তারা। তাঁদের আলোচনার চটকদার শিরোনাম ফেইসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ভেসে বেড়াচ্ছে। কেউ বলছেন ইমাম মাহদী জন্মগ্রহন করেছেন, কেউ বলছেন তাঁর আগমনের সম্ভাব্য সাল ২০২১। কারও দৃষ্টিতে তিনি বর্তমানে ইয়ামনে আছেন, কেউ তাকে তালেবানদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। কেউ স্বয়ং ইমাম মাহদীকে সঊদী আরবে দেখে এসে বর্ণনা করছেন যে, ইমাম মাহদীর বৈশিষ্ট্যের সাথে সেই মাহদীর ৭৫টি আলামতের মিল খুঁজে পাওয়া গেছে! কেউবা আবার স্বপ্নযোগে ইমাম মাহদীর সাথে সাক্ষাৎ করছেন। এরই মধ্যে মুস্তাক মুহাম্মাদ আরমান খান নামক এক ব্যক্তির নাম ইথারে গুঞ্জরিত হচ্ছে। তিনি আবার স্বয়ং নিজেকেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী দাবী করে বসেছেন।

রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে টঙ্গীর বাসিন্দা মুস্তাক মুহাম্মাদ আরমান খানের ডাক নাম মুন্না। তিনি ২০০৬ সালে বুয়েট থেকে অনার্স পাশ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য মালয়েশিয়া গমন করেন। বুয়েট তৃতীয় বর্ষে থাকাকালীন তাবলীগ জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত হন। দাওয়াতী কাজে ২০১৬ সালে উগান্ডায় ১ মাস অবস্থান করেন। পড়াশোনা শেষে কিছু কাল ঢাকার 'ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি' নামক কোন এক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ২০১৮ সালের অক্টোবরে স্বপরিবারে মক্কায় চলে যান। তার লিখিত ও অনূদিত মোট ৯টি বই বাযারে চালু আছে। বইয়ে লিখিত তার আরও একটি পরিচয় হ'ল- টঙ্গীতে অবস্থিত 'মাদ্রাসাতু তা'লীমিল ইসলাম' নামক এক মাদ্রাসার মহাপরিচালক ও প্রধান শিক্ষিক তিনি। অনেক দিন থেকেই আরমান খান লেখনী ও ইউটিউবে বক্তব্যের মাধ্যমে ইমাম মাহদী, করোনা ভাইরাস ও গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে আসছিলেন। প্রথমত তিনি নিজেকে ইমাম মাহদীর সৈনিক দাবী করে জিহাদের প্রস্তুতির জন্য মানুষকে তার দলে যোগদানের আহবান জানান। তার এসব চটকদার কথায় বিভ্রান্ত হয়ে করোনার এই সংকট মুহূর্তেও ঢাকা থেকে মাহদীর সৈন্যদলে যুক্ত হ'তে সঊদী আরব যাওয়ার চেষ্টা করায় গত ৪ই মে ১৭ জনের এক দলকে পুলিশ আটক করে মামলা দায়ের করে।[১]

অবশেষে তথাকথিত এই ইমাম মাহদীর সৈনিক ১৪ই আগষ্ট'২০ ধারণকৃত এক ভিডিও বার্তায় স্বয়ং নিজেকেই ইমাম মাহদী ও রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধর দাবী করে তার পক্ষে বায়'আতের আহবান জানায়। ইউটিউব ও ফেইসবুকে ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর রীতিমত মিডিয়া পাড়ায় হৈ চৈ পড়ে যায়। গত ২২শে আগষ্ট শনিবার পুলিশ বাদী হয়ে ঢাকার রমনা থানায় স্ব-ঘোষিত ইমাম মাহদী বাংলাদেশীর বিরুদ্ধে মামলা করে।[২]

রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় বেশ কিছু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। যেগুলোর মধ্যে কিছু ভবিষ্যৎবাণী তিনি জীবিত থাকতেই প্রকাশ পায়, কিছু ছাহাবীদেও যুগে প্রকাশ পায় এবং এখনো কিছু অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। এগুলো কখন কীভাবে প্রকাশ পাবে তার নির্দিষ্ট কোন সন তারিখ তিনি উল্লেখ করেননি। তবে অনেক ক্ষেত্রে আলামত বা নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। তেমনই ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে ইমাম মাহদীর আগমন বড় আলামতগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই পৃথিবী যখন অন্যায়-অশ্লীলতায় ডুবে যাবে এবং সর্বত্র যুলুম ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হবে, ঠিক তখনই ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে। তাঁর যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পৃথিবীময় পুনরায় ন্যায়বিচারের সুবাতাস প্রবাহিত হবে। সম্ভবতঃ এই নেতৃত্ব ও সম্মানের মোহে মুসলিম বিশ্বে যুগ যুগ ধরে মস্তিষ্ক

১. ৪ মে ২০২০, দৈনিক যুগান্তর।
২. ২৩ আগস্ট ২০২০, দৈনিক যুগান্তর।

বিকৃত কিছু লোকের আর্বিভাব ঘটে আসছে, যারা নিজেদেরকে ইমাম মাহদী দাবী করে মিথ্যা আস্ফালন করছেন। মুস্তাক মুহাম্মাদ আরমান খান সে পরিসংখ্যানে আরও একটি সংখ্যা যোগ করলেন মাত্র। সেই ছাহাবীদের যুগ থেকেই যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে নিত্য-নূতন মাহদী আবির্ভূত হচ্ছেন, যাদের সংখ্যা নেহায়েৎ কম নয়। তন্মধ্যে আলী বংশের মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান হাসানী (৯৩-১৪৫ হিঃ)-কে অনেকেই মাহদী মনে করতেন। ১৪৫ হিজরীতে আব্বাসী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তাকে হত্যা করা হয়। ২৯৬ হিজরীতে মাহদী দাবী করেন কাইরোয়ানের উবাইদুল্লাহ বিন মাইমূন কাদ্দাহ (২৫৯-৩২২ হিঃ)। পরবর্তীতে তাঁর পৌত্র আল-মুঈয ইবনুল মানছূর এবং মরোক্কোর আলেম হিসাবে পরিচিত মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন তাওমারতও (৪৮৫-৫২৪ হিঃ) একই দাবী করেন। মরোক্কোর আরেক ছূফী আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন আব্দুল্লাহ সালজামাসী (৯৬৭-১০২২ হিঃ) মাহদী দাবী করে মরোক্কোর তৎকালীন শাসককে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত করতঃ সালজামাস শহর দখল করেন। ১০২২ হিজরীতে এক যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ১২৯৮ হিজরীতে সুদানের সুপ্রসিদ্ধ ছূফী মুহাম্মাদ আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ (১২৫৯-১৩০২ হিঃ), ১৫ শতকে উত্তর ভারতে সাইয়েদ মুহাম্মাদ জৈনপুরী (১৪৪৩-১৫০৫ খ্রিঃ) এবং বাহাই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আলী ইবন মিরযা রিদা শীরাযী ইরানে মাহদী দাবী করেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৪০০ হিজরীর প্রথম দিন ১৯৭৯ সালে ফজরের সময় মসজিদুল হারাম দখল করে জনৈক মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ কাহতানী নিজেকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী দাবী করেন। অনেকগুলো লাশের কফিনে অস্ত্র ভরে মসজিদে ঢুকে অবরোধ করে রাখে। সঊদী পুলিশের টানা ১৫ দিনের প্রচেষ্টায় কথিত মাহদী ও তার অনুচররা প্রায় সকলেই নিহত হয়।[৩]

উপমহাদেশে কাদিয়ানী মতবাদের আবিষ্কর্তা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮) নিজেকে মাহদী, ঈসা মসীহ ও আখেরী নবী দাবী করে। ইংরেজদের ছাপোষা তাবেদার গোলাম আহমাদ ১৮৯১ সালে মাহদী দাবী করে। ইরানের বারো ইমামে বিশ্বাসী শী'আদের আক্বীদা হ'ল- ইমাম মাহদী ১১তম শী'আ ইমাম হাসান আসকারীর সন্তান। তিনি জন্মগ্রহণ করে ২৬৫ হিজরীতে ৯ বছর বয়সে লুকিয়ে পড়েন এবং ক্বিয়ামতের পূর্বে আবার বের হবেন। শী'আদের কিতাবগুলোতে এ ধরণের অন্ধ কুসংস্কারপূর্ণ বর্ণনায় ভরপুর। শামসুদ্দীন ইবনে খাল্লেকান-এর وفيات الأعيـــان কিতাবের বরাত দিয়ে শী'আদের এক কিতাবে লেখা হয়েছে; ইবনু খাল্লিকান বলেন, 'আবুল ক্বাসেম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল আসকারি ইবনে আলী আলহাদি ইবনে আল জাওয়াদ শী'আদের ১২তম ইমাম। হুজ্জাত তার প্রসিদ্ধ লক্বব। শী'আরা সর্বদা তাকে মুন্তাযের (প্রতিক্ষীত) ক্বায়েম (জীবন্ত) এবং মাহদী (হেদায়েত প্রাপ্ত) মনে করে। তিনি ২৫৫ হিজরীর শা'বান মাসের ১৫ তারিখে জুম'আর দিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৫ বছর। তাঁর মায়ের নাম খাম্ত্ব, কেউ কেউ নারজেসও বলে থাকেন।[৪]

ইরানীরা যুগ যুগ ধরে এ ধরণের বিচিত্র আক্বীদা পোষণ করায় তাদের দেশেও ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন মাহদীর আবির্ভাব ঘটে। যেমন- ইরানী শী'আ দিয়া আব্দুল যাহ্রা কাদীম, যিনি মাহদী দাবী করে ২০০৭ সালে মারা যান। বিশ শতকের আরেক ভণ্ড রিয়ায আহমাদ গোহারশাহী একই দাবী করে। পাকিস্তানী নিউজ এজেন্সীর তথ্যমতে ২০০৩ সালে সে মারা যায়।[৫]

২০০২ সালে খোদ ঢাকায় ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হন। এই মাহদী মানুষের সমর্থন আদায়ের জন্য প্রচারপত্র বিলি করে। তাতে লেখা হয়- 'মানবজাতির জ্ঞাতার্থে অবহিত করা যাচ্ছে যে, বর্তমানে বিশ্বের ইমামতের দায়িত্বে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন.....হযরত মুহাম্মাদ জুলকিফিল (সঃ).....তিনিই খাযা খিযির।.....তিনি 'আব্বা আল্লাহ' তথা 'হুজ্জাতুল্লাহ'। আবার যিনি বাঘে মহিষে একই ঘাটে পানি পান করাতে বাধ্য করবেন তিনি হলেন..... হযরত মুহাম্মাদ জুলকারনাইন (সঃ) তথা ইমাম মাহদী ঈসা। তিনি ঢাকার গেণ্ডারিয়াস্থ কৈলাশপুরীতে অবস্থান করে এ বিশ্বে সৃষ্ট দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মা'জুজকে খতম করে শান্তি আনয়ন করতে ব্যস্ত।' তার শ্লোগান ছিল 'আব্বা আল্লাহ ইমাম মাহদী হুজ্জাতুল্লাহ, এক নেতা এক বিশ্ব, ইমাম মাহদী সর্বশ্রেষ্ঠ, মাহদী খিযির ঈসা- বিশ্ব মানবের দিশা!'[৬]

জনৈক পীর লুৎফর রহমান ২০১১ সালের দিকে কখনো মাহদী ও কখনো মাহদীর সৈনিক হিসাবে নিজেকে দাবী করেন। ২০১৩ সালে রাজধানীর গোপীবাগের একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে নিজ ছেলে ও কতক মুরীদ সমেত দুর্বৃত্তদের হাতে প্রাণ হারান। তাকে গলা কেটে হত্যা করা হয়।[৭] ২০১৬ সালে মিসরের মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল নাছের ফেইসবুকে মাহদী দাবী করে।

এভাবে যুগের আবর্তে ভণ্ডরা যেন অমাবশ্যার নিকষ কালো রজনীতে কালো পিঁপড়ার ন্যায় আবির্ভূত হয়েছে, আবার কালো মাটির অভ্যন্তরেই সমাধিস্থ হয়েছে। কাঙ্খিত মাহদী আসার পূর্বে এ রকম আগাছাদের আবির্ভাব ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) এরূপ মিথ্যুক দাজ্জালদের

৩. *আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর পৃ: ৫১৪-১৮।*

৪. *তারীখু ইবনু খাল্লেকান, মিসর ছাপা, ৩/৩১৬পৃ; খোরশেদে মাগরেব (ফার্সী), মুহাম্মাদ রেযা হাকিমী- ১৯ পৃ.।*

৫. *https://en.wikipedia.org*

৬. *আত-তাহরীক, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ২৯।*

৭. *২৩ ডিসেম্বর ২০১৩, বাংলাদেশ প্রতিদিন।*

আবির্ভাবের ভবিষ্যতবাণী করেছেন। সুতরাং যুগে যুগে এমন ভণ্ড ইমাম মাহদীদের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাদের লাঞ্ছনাকর পতন হবে-এটাই সত্য। তাইতো ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, 'মাহদী হবেন ন্যায় ও ইনছাফের চূড়ান্ত; যেমন দাজ্জাল হবে অন্যায় ও অত্যাচারের চূড়ান্ত। তবে প্রধান মাহদী ও প্রধান দাজ্জাল আগমনের পূর্বে অনেক দাজ্জাল, অনেক মাহদীর আগমন ঘটবে।[৮]

সম্প্রতি আবির্ভূত ইমাম মাহদী দাবীদার মুস্তাক মুহাম্মাদ আরমান খানের দাবীর পাল্টা জবাব দেওয়া নিছক কালক্ষেপন ছাড়া কিছুই নয়। ইসলামের একজন সাধারণ পাঠকও খুব সহজেই বুঝতে সক্ষম হবে যে, তিনি গোমরাহীর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছেন। তিনি স্বীয় দাবীকে প্রমাণের জন্য কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা দিয়ে মাহদী বিষয়ক হাদীছগুলোর ব্যবচ্ছেদ করেছেন। সেই সাথে দলীল সাব্যস্ত করার জন্য কৌশলে আরবী আবজাদী হরফ বা সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন, যা বড়ই হাস্যকর। সেজন্য তাকে বিশিষ্ট গণিতবিদ মাহদী ডাকলে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। বস্তুতঃ একজন কমজানা মুমিনও জানেন যে, ইসলামী শরী'আতের কোন কিছু প্রমাণের জন্য কুরআন ও হাদীছের অকাট্য দলীল প্রয়োজন। সেখানে আরবী সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার চরম মূর্খতা বৈকি! কথিত এই মাহদীর বক্তব্য শুনে ও বই পড়ে বোঝা যায় সে কল্পনার জগতে হারিয়ে নিজ মস্কিষ্ক বিকৃত করার পর স্বপ্নে ইমাম মাহদী হওয়ার অহী (?) পেয়েছেন। আর এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই কারণ তিনি যে জামা'আতের সাথে চলাফেরা করতেন তাদের কিতাবসমূহ এরকম স্বপ্ন, কাশফ-কারামত ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনীতে ভরপুর। হতে পারে সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। অথবা মাহদী বিষয়ে জমহূর আলেমদের আক্বীদা বর্জন করে নিজেকে মাহদী দাবী করবেন, তাই পূর্ব পরিকল্পনার অংশ হিসাবে রাস্তা পরিস্কার করছিলেন।

কেননা 'অপরিচিত ইসলাম ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক তার এক বইয়ে ইমাম মাহদী বিষয়ে তিনি লিখছেন যে, 'ইমাম মাহদী মদীনার পূর্ব দিক থেকে আসবেন বলে হাদীছে যা বর্ণিত হয়েছে তাতে পূর্ব দিক বলতে বাংলাদেশ এবং মদীনা অর্থাৎ কোন এক শহরকে বোঝানো হয়েছে। হতে পারে মাহদী ইণ্ডিয়া বা বাংলাদেশের কোন এক শহরে আছেন।[৯] আরও লিখেছেন, 'ইংরেজী ২০৮৬-৮৭ সালে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে। ১৪৮৭, ১৪৯০ অথবা ১৫০১ হিজরীতে ঈসা (আঃ) দুনিয়া থেকে চলে যাবেন এবং ১৫১০ হিজরীতে কুরআন উঠিয়ে নেওয়া হবে। এরপর টিকায় লিখেছেন, 'আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন করতে সক্ষম। ব্যাপক গবেষণা ও মহান আল্লাহ্র ইশারাতে (?) বলা হ'ল'।[১০] একই বইয়ের ৫৮ ও ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন 'ইমাম মাহদী ১৪৪১ হিজরীতে (জুলাই ২০২০) আসবেন। অতঃপর টিকায় লিখেছেন, 'এক সময় লেখক ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের দিনক্ষণ নিয়ে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছেন ও এস্তেখারার আমল করে যে সংকেত পেয়েছেন তাই উল্লেখ করা হয়েছে।'

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে নিজেকে ইমাম মাহদী হিসাবে উপস্থাপনের জন্য আগে থেকেই তিনি দিন তারিখ নির্ধারণ করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সে মতেই ১৪৪১ হিজরীর শেষাংশে (১৫ই আগষ্ট ২০২০) স্বয়ং মাহদী হয়ে আবির্ভূত হন। সুতরাং তার বাতুলতাপূর্ণ বক্তব্য ও লেখনীর আসার দাবী খণ্ডন করা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।

সুধী পাঠক! হাদীছের ভাষ্যমতে ক্বিয়ামতের পূর্বে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী আসবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর আসার পূর্বে ক্বিয়ামতের বড় আলামত প্রকাশ পাবে। যেমন- ফোরাত নদীতে সোনার পাহাড় জেগে উঠবে, যার মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্বে একশ জনে ৯৯ জন মারা যাবে। একজন খলীফার মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র ধন ভাণ্ডারের দখল নিয়ে আপোষে লড়াই করবে, কিন্তু কেউ সে ধনের মালিকানা পাবে না।[১১]

পৃথিবী থেকে ন্যায় ইনছাফ উঠে যাবে। অত্যাচার-অনাচারের কালো মেঘ পৃথিবীর আকাশকে গ্রাস করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দুনিয়ার মাত্র একদিন বাকী থাকলেও আল্লাহ তা'আলা সে দিনটিকে লম্বা করবেন এবং আমার পরিবার থেকে একজনকে প্রেরণ করবেন। তাঁর নাম হবে আমার নাম এবং তাঁর পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম অর্থাৎ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। তিনি ফাতেমা (রাঃ)- এর বংশধর হবেন। তাঁর নাক লম্বা ও কপাল হবে উজ্জ্বল অর্থাৎ প্রশস্ত কপালের সম্মুখভাগে কোন চুল থাকবে না।[১২]

তিনি মদীনার পূর্ব দিক থেকে এসে মক্কায় আশ্রয় নিবেন। রুকনে ইয়ামানী ও মাক্বামে ইবরাহীমের মাঝখানে লোকেরা তাকে চিনতে পেরে তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বায়'আত করবে। অতঃপর এই খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর বিরুদ্ধে সিরিয়া থেকে সৈন্য প্রেরণ করা হবে। সৈন্যরা মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি 'বায়দা' নামক স্থানে আসলে আল্লাহ তাদের ভূমিতে ধ্বসিয়ে দিবেন। কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকেদের খবর অন্যদের কাছে পৌঁছানোর জন্য শুধুমাত্র একজন জীবিত থাকবে। ক্বিয়ামতের মাঠে ধ্বংসপ্রাপ্তদের যার যার নিয়ত অনুসারে আল্লাহ তাদের বিচার করেবেন।[১৩]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আখেরী যামানায় আমার উম্মতের মধ্যে ইমাম মাহদীর আর্বিভাব ঘটবে। তাঁর শাসনকালে আকাশ থেকে প্রচুর

---

৮. অধ্যাপক আব্দুল মুহসিন বিন হামাদ আল-আব্বাদ এর এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত- الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة والواردة في المهدي ويليه عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر

৯. অপরিচিত ইসলাম ও আমাদের করণীয় পৃঃ ৪৫।

১০. অপরিচিত ইসলাম ও আমাদের করণীয় পৃঃ ৫৯।

১১. রিয়াযুস সালেহীন (অনু: তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ ২য় খণ্ড হা/ ১৩৬৭।

১২. আবু দাঊদ হা/৪২৮৪, ৪২৮৫।

১৩. আল-ফিকহুল আকবার পৃঃ ৫১১; আবু দাঊদ হা/৪২৮৯।

বৃষ্টিপাত হবে। জমিন প্রচুর ফসল উৎপন্ন করবে। তিনি মানুষের মাঝে সমানভাবে প্রচুর সম্পদ বিতরণ করবেন। গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং উম্মতে মুহাম্মাদীর সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তিনি সাত কিংবা আট বছর জীবিত থাকবেন।'[১৪]

অতঃপর এই সুখ-সমৃদ্ধি ধ্বংস করার জন্য দাজ্জাল আসবে। ঈসা (আঃ) দুই ফেরেশতার ডানায় ভর করে সিরিয়ার দামেশকের শ্বেত মিনার বিশিষ্ট কোন এক মসজিদের ছাদে ফজরের সময় অবতরণ করবেন। তাকে ছালাতের ইমামতির সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু তিনি ইমাম মাহদীর পিছনে ছালাত আদায় করবেন। ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে খুঁজে বের করে হত্যা করবেন। ফলে পৃথিবী থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, জুলুম নিপীড়ন মিটে গিয়ে শান্তির ফাল্গুধারা বইবে।[১৫]

এহেন মুহূর্তে ইয়াজুজ মা'জুজ সম্প্রদায় আসবে। তাদেরও পতন হবে, ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) মারা যাবেন। পর্যায়ক্রমে শান্তির পৃথিবী থেকে নেককারদের মৃত্যু হবে। পরিশেষে আল্লাহ বদকারদের উপর ক্বিয়ামত কায়েম করবেন।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান পৃথিবীতে অশান্তির দাবানল জ্বলজ্বল করলেও এখনো ইমাম মাহদী আসার সময় হয়নি। কেননা তাঁর আগমনের পূর্বের বড় আলামতগুলো এখনো অপ্রকাশিত। তিনি আসলে তাঁর শারিরীক বৈশিষ্ট্য দেখে সে যুগের গুণীজনেরা তাকে চিনতে পেরে জোরপূর্বক বায়'আত নিবেন। না তিনি কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা চালাবেন আর না তাঁর স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ) দেখা দিয়ে তাকে মাহদী ঘোষণা করবে। তাই তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে কেউ নিজেকে রাসূলের বংশধর মাহদী দাবী করলে সে নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী ও নিরেট ভণ্ড ছাড়া কিছুই নয়।

অপরদিকে ক্বিয়ামত বা ইমাম মাহদী সংক্রান্ত বিষয়টি ইলমে গায়েবের অন্তর্ভূক্ত যা আল্লাহ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) কেউ স্পষ্ট করে জানাননি। এ জ্ঞানের চাবিকাঠি তিনি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীছে যেভাবে যতটুকু বর্ণনায় এসেছে ততটুকু বর্ণনা করাই সালাফী আলেমদের নীতি। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 'যে বিষয়ে তোমার কোন জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় চোখ, কান ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনূ ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*।

তাই জাতির বিবেক আলেম সমাজের প্রতি প্রত্যাশা থাকবে, তারা যেন গায়েবের বিষয়গুলো নিয়ে অপ্রয়োজনীয় নাড়াচাড়া করে সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট না করেন। বর্তমানে কতিপয় আলেম যে ধারণার বশবর্তী হয়ে বক্তব্যে কিংবা গবেষণার নামে পৃথিবীর বয়স নির্ণয়, ক্বিয়ামতের সময় ও ইমাম মাহদীর আগমনের সময় নির্ধারণ করছেন, তা কতটুকু যৌক্তিক? এমন নয়া মাহদীতত্ত্বের চোরাবালিতে আমাদের দেশ, সমাজ, বিশেষতঃ যুবসমাজকে যেন হারিয়ে না ফেলি। সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা পরিপন্থী এমন কোন গবেষণা মানসিক দুর্বলতা বা হীনমন্যতার বহিঃপ্রকাশ, যা কালজয়ী মুসলিম আদর্শকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এরকম দিবা স্বপ্নে বিভোর না হয়ে নিজের আমলের পরিশুদ্ধতা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য সুন্নাতের পাবন্দী হয়ে সালাফে ছালেহীনের পরিচ্ছন্ন পথে চলাই হৌক আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। কেননা প্রকৃত ইমাম মাহদীর আগমন ঘটলে কেবল ঈমানদাররাই তাঁকে চিনতে পারবে, যদি তিনি কোন সুদূর পাহাড়ের গুহায় থাকুন না কেন। আর বেঈমান, ভণ্ড ও মুনাফিকরা তাঁকে কখনই চিনতে পারবে না, যদিও তিনি তাদের চক্ষুসম্মুখে অবস্থান করুন না কেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হবে নিজ নিজ ঈমানের পরিচর্যা করা এবং আমলের মাধ্যমে তা পোক্ত করা। এতেই আমাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে।

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

আল-'আওন
টেলিমেডিসিন সেবা
চিকিৎসা বিষয়ক যেকোন সমস্যায়
এমবিবিএস ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিন
পুরুষদের জন্য
০১৭১১ ১০২ ৫৪৬ | ০১৭২৩ ৭৭১ ০৯০
০১৭২৫ ৬৪৭ ৪১৩ | ০১৭১০ ৪৪০ ৫৯৭
০১৯২০ ৭০৩ ৮৩৫
শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য
০১৭১১ ৮১০ ৮০৭ | ০১৭৬৬ ৯৮২ ৪৫৬
০১৯৫৯ ২১৪ ৪৪৫
প্রতিদিন বিকাল ৪-টা সন্ধ্যা ৭-টা পর্যন্ত
আল-'আওন রেজিঃ নং রাজ ৫০৯১
(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (পূর্ব পার্শ্ব ২য় তলা), নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী-৬২০৩। মোবাইল : ০১৭২৩ ৯৩৮ ৩৯৩, ওয়েবসাইট : http://www.alawon.com

১৪. মুসতাদারেক হাকেম ৪/৬০১ পৃঃ।
১৫. মুসলিম হা/২৯৩৭, ২৯৪০।

সাক্ষাৎকার : জনাব আব্দুর রহমান

*[উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বেনিয়াদের আতংক বাংলাদেশের দক্ষিণের জনপদ সাতক্ষীরার অন্যতম মুজাহিদ ঘাঁটি হাকিমপুরের (বর্তমানে ভারত) অদূরে জন্মগ্রহণ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বর্ষীয়ান খাদেম সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুর রহমান (৮১)। ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী জোট সরকারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দূর্যোগমুহূর্তে যে সকল বয়োজেষ্ঠ্য মুরুব্বী আহলেহাদীছ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতাকর্মীদেরকে পিতৃস্নেহ দিয়ে বুকে আগলে রেখে অনন্য অভিভাকত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। ফাসাদপূর্ণ দুনিয়ায় সর্বত্র স্বার্থপরতা ও নিফাক্বীর ডামাডোলে সাতক্ষীরা যেলার প্রিয়মুখ জনাব আব্দুর রহমান ছিলেন আমীরে জামা'আতের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও অন্তঃপ্রাণ সহযোগী। বয়সের ভারকে উপেক্ষা করে সদা হাস্যজ্জ্বল, সদালাপী ও কর্মচঞ্চল এই মানুষটি একটি সুসংহত ও শক্তিশালী আহলেহাদীছ জামা'আত গঠনের মিছিলে আজও অগ্রসৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ রয়েছেন। নিজেকে রহমানের একনিষ্ঠ বান্দা হিসাবে প্রমাণে সদা সচেষ্ট থাকতে চেয়েছেন তার প্রতিটি কথা, কর্ম ও কাজে। সম্প্রতি তিনি আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পর রাজশাহীতে তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন তাওহীদের ডাক-এর সহকারী সম্পাদক **মুখতারুল ইসলাম**]*

তাওহীদের ডাক : আপনি কেমন আছেন? আপনার শারীরিক অবস্থা কেমন?

জনাব আব্দুর রহমান : আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে এবং সকলের দো'আর বরকতে আল্লাহ খুবই ভাল রেখেছেন। সুস্থাবস্থায় দেশে আসতে পেরেছি তাই আবারও আলহামদুলিল্লাহ পড়ছি।

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি জানতে চাই।

জনাব আব্দুর রহমান : আমার জন্ম ১৯৩৯ সালে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপযেলার সোনাবাড়িয়া ইউনিয়নের রাজপুর গ্রামে। বৃটিশ বিরোধী জিহাদ আন্দোলনের সুপ্রসিদ্ধ ঘাঁটি হাকিমপুর আমার বাড়ি থেকে ৩ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। দাদার নাম ছিল ভাটাই সরদার। আমার আব্বা মুন্সী মুহাম্মাদ আহমাদ আলী সরদার এক বাপের এক ছেলে। তারও আমি একমাত্র ছেলে ও আমার দুই বোন ছিল। মায়ের নাম দুলাল নিছাবিবি। আমার পিতা তদানীন্তনকালে ৬ নং সোনাবাড়িয়া ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন দীর্ঘদিন। সেই সময় এলাকার কোন মসজিদে ইমাম-মুওয়াযযিন রাখা হত না। তাই আমাদের বাড়ীর সাথে মসজিদ থাকায় আমার পিতা বিনা ভাতায় ইমাম ও মুওয়াযযিন হিসাবে আমরণ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আমার বাবাকে দেখেছি আমাদের মসজিদে কোন মেহমান আসলে তিনি আমাদের বাড়ীতেই থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। আলেম-ওলামা যে যেখান থেকে আসুক মসজিদের মুতাওয়াল্লী হিসাবে তাঁদের আপ্যায়নের সকল দায়িত্ব বাবা পালন করেছেন। বর্তমানে আমিও করে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত করে যাব।

তাওহীদের ডাক : আপনি 'হাজী ছাহেব' হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত। এ পর্যন্ত কতবার হজ্জ করেছেন?

জনাব আব্দুর রহমান : আমার বাবা ১৯৮৩ সালে হজ্জ করার নিয়ত করেন। ঐ বছরেই বাবার শরীরে পক্স উঠলে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি একদিন আমার দুই ভগ্নীপতি ও আমার বড় জামাইসহ সবাইকে ডাকলেন। তিনি বললেন, আমি তো হজ্জের নিয়তে টাকা জমা দিয়েছি। কিন্তু চোখে না দেখার জন্য হজ্জে যেতে পারলাম না। তোমাদের কে আমার বদলী হজ্জ করবে? তখন আমি বললাম, আমিই করব ইনশাআল্লাহ! তিনি ১৯৮৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। বাবার কথামত প্রথমে আমি আমার নিজের হজ্জ করলাম ১৯৮৫ সালে। তারপর আব্বার হজ্জ করলাম ১৯৮৭ সালে। সে সময়ের হজ্জ ছিল বর্তমানের তুলনায় খুবই কঠিন। মীনার ময়দানে মানুষ নিজেরাই রান্নাবান্না করত, দূর-দূরান্ত থেকে পানির ব্যবস্থা করত। মাইলের পর মাইল পায়ে হেটে চলতে হত। কখনও প্রাণহানির আশংকা থাকত। ২০০২ সালে আবার সস্ত্রীক হজ্জে যাই আলহামদুলিল্লাহ। সম্প্রতি ২০১৮ সালেও হজ্জ করার সুযোগ হয়েছে। এবছর ২০২০-এও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু করোনার কারণে আর সম্ভব হ'ল না। যেহেতু আশি-নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত হজ্জ যাত্রা থেকে শুরু করে হজ্জের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য এবং বাংলাদেশী হজ্জযাত্রীর সংখ্যা ছিল খুব কম, সেজন্য হাজীদেরকে সমাজের মানুষ আলাদাভাবে সম্মান করত। এভাবেই তৎকালীন প্রচলন অনুসারে আমার নামের সাথে হাজী সম্বোধন জুড়ে যায়।

তাওহীদের ডাক : আপনি যে হাকিমপুরের কথা বললেন সেখানে কি মাওলানা আকরম খাঁর জন্ম? জিহাদ আন্দোলনের কোন প্রভাব আপনার এলাকায় পড়েছিল বলে আপনি মনে করেন?

জনাব আব্দুর রহমান : জ্বী, ভারতের চব্বিশ পরগনায় হাকিমপুরে প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মাওলানা আকরম খাঁর জন্ম। আমার যতদূর জানা, মাওলানা আকরাম খাঁর পিতা ও পিতামহরা বড় বড় আলেমে দ্বীন ছিলেন। পাক-ভারত

উপমহাদেশে ইংরেজ তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে আহলেহাদীছদের পবিত্র জিহাদ আন্দোলন পরিচালিত হত এই হাকিমপুর কেন্দ্র থেকে। বাপ-দাদাদের মুখে শুনেছি ঐ সময় হিন্দু জমিদাররা খুবই প্রভাবশালী ছিল। ওদের বেধে দেয়া নিয়ম সবাইকে মেনে চলতে হত। যেমন বড় বড় প্রজাদের কাছে পূজার সময় তারা বলী দেওয়ার জন্য পাঠা নিত। একেক বছর একেক জনকে বলত তোমাকে এবার পাঠা দিতে হবে। আমাদের এলাকাতেও তাদের জমিজমা ছিল। তারা আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও এসব কাজে বাধ্য করত। অবশেষে হাকিমপুর কেন্দ্রের দাওয়াতের বরকতে আমাদের এলাকা হিন্দু প্রভাব মুক্ত হয় এবং আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়।

তাওহীদের ডাক : আপনার ছাত্রজীবন সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

জনাব আব্দুর রহমান : সত্য বলতে কি, আমি পড়াশোনা বেশী দূর করিনি। অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান হিসাবে সব সুযোগই ছিল, কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে তো আর হয়না। আমার আব্বা আম্মা বেঁচে থাকার পরও পড়তে পারিনি। তার কারণ ছিল তখন স্কুল-কলেজ এত নিকটে ছিল না। হাইস্কুল ছিল আমার বাড়ী থেকে ১০ কি.মি. দূরে কলারোয়া। আর প্রাইমারী স্কুলে যেতে হত আমার বাড়ী থেকে সোনাই নদী পার হয়ে ভেলা, ডোঙ্গা অথবা নৌকায় চড়ে। সোনাই নদীর পূর্ব পাড়ে হ'ল প্রাইমারী স্কুল। তারপরেও মাঝে মাঝে নদী সাতরিয়েও ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সেই স্কুলে পড়েছি। তারপরে ৭ম শ্রেণী পাশ করে ৮ম শ্রেণীতে উঠে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আর স্কুলে যাইনি। তারপরে বাড়ীতে ঘরোয়াভাবে আরবী শিক্ষা অর্জন করেছি। সাতক্ষীরা যেলার সুপরিচিত ক্বারী শাহাদাতকে বাড়ীতে রেখে মাখরাজসহ বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করার চেষ্টা করেছি এবং শিখেছি।

তাওহীদের ডাক : আপনার ছাত্রজীবনের ইতি টেনে আপনি কি কোন পেশায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন?

জনাব আব্দুর রহমান : লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আমার বাবার গৃহস্থালীর হাল ধরি। তিনি পৈত্রিক সূত্রে প্রচুর জায়গা-জমি, বাগ-বাগিচা ও পুকুর পেয়েছিলেন। তারই উপর আমি চাষাবাদ করতাম আলহামদুলিল্লাহ। পরবর্তীতে কৃষি কাজের পাশাপাশি কলারোয়ায় নিজস্ব গোডাউনে দীর্ঘদিন ব্যবসায় যুক্ত থাকি। এক পর্যায়ে দুনিয়াবী ব্যস্ততা ছেড়ে সংগঠনে মন দিই এবং যুবসংঘ- আন্দোলনে প্রচুর সময় দিতে থাকি। সেই থেকে আমীরে জামা'আতের নির্দেশে আমি এখনও পর্যন্ত প্রাণপণে আহলেহাদীছ আন্দোলন ও যুবসংঘকে এগিয়ে নিতে সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছি। সবাই দো'আ করবেন যেন মৃত্যু অবধি এ ধারা অব্যাহত থাকে।

তাওহীদের ডাক : আপনি কখন বিয়েশাদী করেছেন? আপনার ছেলে-মেয়ে কতজন? তারা এখন কোথায় কী করে?

জনাব আব্দুর রহমান : আমি বাংলা ১৩৬৪ (১৯৫৮ইং) সালে বিয়ে করেছি। আলহামদুলিল্লাহ আমার মোট ১০ জন সন্তান। ৫ ছেলে ও ৫ মেয়ে। সবারই বিয়ে দিয়েছি। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদরাসার সিনিয়র শিক্ষক শাসমুল আলম আমার এক জামাই এবং পিস টিভির আলোচক ও দাঈ হাফেয আখতার মাদানী আমার আরেক জামাই। বাকি মেয়েদের অন্যান্য জায়গায় বিয়েশাদী দিয়েছি। আর ছেলেদের মধ্যে আমার বড় ছেলে আমেরিকা প্রবাসী এবং ছোট ছেলেটা কানাডা প্রবাসী। আরেক ছেলের সাথে প্রবীণ আলেমে দ্বীন মরহূম মাওলানা বদীউযযামানের মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। সে চাকুরী করে। বাকিরা দেশে বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত।

তাওহীদের ডাক : আহলেহাদীছ আন্দোলনের দুর্গ বলে পরিচিতি সাতক্ষীরাতে বিশুদ্ধ ইসলামী দাওয়াত কিভাবে এত প্রসার লাভ করল বলে আপনি মনে করেন?

জনাব আব্দুর রহমান : মূলতঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পিতা মাওলানা আহমাদ আলীর দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে সাতক্ষীরায় বিশুদ্ধ ইসলামী দাওয়াতের এত প্রচার-প্রসার হয়েছে বলে আমি মনে করি। তিনি সাতক্ষীরায় আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রাণপুরুষ ছিলেন। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে তাকে দেখেছি। আমার বুদ্ধি হওয়ার আগেও উনি আমাদের এলাকায় দাওয়াতী কাজ করেছেন। উনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন দাওয়াতের কাজ করার মত লোক আমার চোখে পড়েনি। পরে মাওলানা মতীয়ার রহমান কাজ করেছেন। উনি পড়াশুনা করে আসার পরে খুলনা-যশোর যেলা জমঈয়তের সভাপতি ছিলেন। তিনি বয়সে উনার অনেক জুনিয়র। মাওলানা আহমাদ আলী ছাহেবের দাওয়াতী তৎপরতার সাথে তার কোন তুলনা নেই। মাওলানা আহমাদ আলী ছাহেব তদানিন্তনকালে যদি দুর্বার গতিতে দাওয়াতের কাজ না করতেন তাহলে আমাদের এলাকার অধিকাংশ আহলেহাদীছ মাযহাবী বা পীর-পুজারী হয়ে যেত। শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, তাঁর দাওয়াতের ফসল হিসাবে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষরা আজও জ্বলন্ত সাক্ষী, যা বর্তমান সময়ে চিন্তাই করা যায় না।

তাওহীদের ডাক : শুনেছি মাওলানা আহমাদ আলী কেবল একজন আলেমই ছিলেন না বরং তিনি একজন শিক্ষানুরাগী, আদর্শ শিক্ষক ও সাহিত্যিক ছিলেন। এ বিষয়ে আপনি তাঁকে কতটুকু চিনেন?

জনাব আব্দুর রহমান : আজীবন তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের খেদমতে কাজ করে গেছেন। কীভাবে সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করে ইসলামের বিশুদ্ধ দাওয়াতের প্রচার-প্রসার ঘটানো যায় সেটাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। মসজিদ, মাদ্রাসাসহ জনহিতৈষী কাজে তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। দক্ষিণবঙ্গ তথা বৃহত্তর খুলনা এলাকায় তাঁর সরব পদচারণা ছিল। জাতিকে শিক্ষিত হিসাবে গড়ে তুলতে প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সর্বস্তরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। জীবনে তাঁর একটি স্বপ্ন ছিল আহলেদীছদের জন্য স্বতন্ত্র একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা।

সেটা তিনি শেষ জীবনে করেও গেছেন। অনেক বাঁধা-বিপত্তি থাকলেও আহলেহাদীছ অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ার কারণে তিনি কাকডাঙ্গাকে বেছে নিয়েছিলেন। আর সেটা হ'ল কাকডাঙ্গা সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা। তিনি ছিলেন ঐ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। এর প্রেক্ষাপট ছিল এই যে, সাতক্ষীরার লাউড়ী হানাফী মাদরাসা থেকে মাওলানা শামসুদ্দীনসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রকে রাফউল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায়ের অপরাধে বহিষ্কার করা হয়। তখন তিনিসহ বহিষ্কৃত ছাত্ররা এসে মাওলানা আহমাদ আলীর কাছে এসে কান্নাকাটি করেন এবং একটি আহলেহাদীছ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তখন তিনি এই ঐতিহ্যবাহী মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আর সাহিত্যিক হিসাবেও ছিলেন তৎকালীন দক্ষিণবঙ্গে অদ্বিতীয়। তাঁর লিখিত বই- সংসার পথে (পদ্য ছন্দে), তাহারৎ (পদ্য ছন্দে), আকীদায়ে মোহাম্মদী বা মযহবে আহলেহাদীছ, ছলাতে মোস্তফা বা আদর্শ নামায শিক্ষা, নিয়ত ও দরূদ সমস্যা সমাধান, বিতর্ক ও বিচার, বঙ্গানুবাদ খোৎবা, ছলাতুন্নবী বা মক্তব-মাদরাসার আদর্শ নামায শিক্ষা, সূরা ফাতেহা পাঠের সমস্যা সমাধান, সশব্দে আমীন সমস্যা সমাধান; তারাবীহ সমস্যা সমাধান, রাফ'উল ইয়াদায়েন ও বুকের উপর হাত বাধা সমস্যা সমাধান, কুরআন ও কলেমাখানী, তিন তালাক সমস্যা সমাধান, বঙ্গানুবাদ মীযানুছ ছরফ, হাদীছে আরবাঈন বা চল্লিশ হাদীছ, সরল আরবী ব্যাকরণ ইত্যাদি বইগুলো আজও জাতিকে পথ দেখায় ও অনুপ্রাণিত করে।

তাওহীদের ডাক : মাওলানা আহমাদ আলীর সুযোগ্য সন্তান আমীরে জামা'আতও সাতক্ষীরায় বাঁকাল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে মাদ্রাসার সাথে আপনি নিজেও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এ বিষয়ে বিশেষ কোন স্মৃতির কথা যদি আমাদের শুনাতেন?

জনাব আব্দুর রহমান : আমরা যখন জমঈয়ত থেকে আন্দোলনে এসে কার্যক্রম চালানো শুরু করি, তখন থেকেই উনার একটা স্বপ্ন ছিল সাতক্ষীরা শহরে একটি মাদরাসা করার। সেসময় সাতক্ষীরা যেলার আব্দুল গফূর নামে একজন প্রভাবশালী লোকের কাছে যাওয়া হ'ল। উনি তখন ৪০০ বিঘার সম্পত্তির মালিক। সাতক্ষীরা যেলার সবচেয়ে প্রভাবশালী এমনকি তিনি একসময় মুসলিম লীগের এমপিও ছিলেন। উনি খুব প্রতিপত্তিওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন। সাতক্ষীরা টু চট্টগ্রাম, সাতক্ষীরা টু ঢাকার মাঝে যোগাযোগ উনার দ্বারাই শুরু হয়। তখন তো ফেরী ছিল না। লঞ্চে যাতায়াত করতে হত। এপারে গাড়ী থাকত। আবার ওপার গিয়ে অন্য গাড়িতে ঢাকা কিংবা চট্টগ্রাম যেতে হ'ত। উনি আর উনার বেয়াই দু'জনের এই সরাসরি পরিবহন ব্যবসা ছিল। আমীরে জামা'আতসহ কয়েকজন লোক নিয়ে যাওয়া হ'ল তাঁর কাছে। যাওয়ার পরে হ্যাঁ, হ্যাঁ দেব বলে রাখলেন বহু দিন। কিন্তু কোন কারণে দিলেন না বা সাহায্য করলেন না। অবশেষে আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে যেখানে বর্তমানে মাদ্রাসা করা হয়েছে সেখানে ঐ জমির সন্ধান পাওয়া গেল। অতঃপর ঐ জমিটা আমরা ক্রয় করে নিলাম। জমিটা তখন জলাশয়ের মধ্যে। প্রচুর পানি চারিদিকে। ঐখানেই আমীরে জামা'আতের স্বপ্ন মহান আল্লাহ সফল করলেন। সেখানেই আমরা মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করি।

আমার তিন ছেলে আব্দুল মতীন, আব্দুর রাকীব ও আব্দুর রহীমকে দিয়ে বাঁকাল মাদরাসা উদ্বোধন করা হয়েছে বললে ভুল হবে না। আমাদের ঐ এলাকায় ভালো কোন মাদরাসা না থাকায় আমার ছেলে আব্দুল মতীন প্রথম জীবনে নওদাপাড়া মাদ্রাসায় পড়ত। এখানে এক বছর পড়াশুনা করার পর যখন বাঁকালে মাদরাসা করা হ'ল তখন আমি মাদরাসার দায়িত্বশীল হওয়ার কারণে আমার ছেলেকে নিয়ে চলে আসলাম সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাঁকাল মাদরাসায়। আমি বাঁকাল মাদরাসার জন্মলগ্ন থেকে সহ-সভাপতি হিসাবে খেদমত করেছি। সাথে সাথে তাওহীদ ট্রাস্টের দায়িত্ব পালন করতাম। সাতক্ষীরা যেলায় তাওহীদ ট্রাস্টের মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ সহ যেসকল সমাজসেবামূলক কাজ হ'ত, তার দেখাশুনা ও তদারকি জন্য আমীরে জামা'আত আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

তাওহীদের ডাক : ২০০১ সালে তাওহীদ ট্রাস্টের বেশ কিছু সদস্য অনিয়ম-দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিল। তাওহীদ ট্রাস্টের একজন সদস্য হিসাবে এ সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

জনাব আব্দুর রহমান : আমি যেহেতু সাতক্ষীরা যেলা সহ এ অঞ্চলের সার্বিক দায়িত্বপালন করতাম, সেজন্য তাওহীদ ট্রাস্টের খুঁটিনাটি মোটামুটি জানতাম। ঐ সময় আমি ট্রাস্টের সদস্য না হলেও পরবর্তীতে আমাকে সদস্য করা হয়েছে। যাহোক আমীরে জামা'আতের সরলতার সুযোগ নিয়ে বগুড়ার জনৈক ট্রাস্টির নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন সদস্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে ট্রাস্টকে দখলে নেওয়ার পায়তারা করে। তারা চক্রান্ত করে আমীরে জামা'আতের সরল বিশ্বাসের সুযোগে বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি করত। তাদের সে সকল দুর্নীতি ধীরে ধীরে ফাঁস হতে থাকলে তারা চক্রান্ত করে ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা আমীরে জামা'আতকে সরিয়ে দিয়ে অন্য একজনকে ট্রাস্টের সভাপতি করে ট্রাস্ট দখলের অপচেষ্টা চালায়। এভাবে তারা জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে দুনিয়াবী লোভ-লালসার কাছে বিকিয়ে দেয়। ট্রাস্টের মূল্যবান সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে নষ্ট করে। আল্লাহর আদালতে এবং জাতির কাছে তাদের একদিন এই বিশ্বাসঘাতকতা ও দূর্নীতির হিসাব দিতেই হবে। ইতিহাস তাদেরকে ক্ষমা করবে না।

তাওহীদের ডাক : আপনার সাংগঠনিক জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

জনাব আব্দুর রহমান : যেহেতু আমরা আহলেহাদীছ তাই আমার জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে জমঈয়তে আহলেহাদীছের সাথে যুক্ত ছিলাম। মানুষকে একনিষ্ঠভাবে

দাওয়াত দিতাম। আমাদের কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক দাওয়াতে হানাফীরা ভাইয়েরা কোণঠাসা হয়ে পড়ত এবং আমাদের কোন প্রশ্নেরই সদুত্তর তাদের নিকট পেতাম না। তারপর একসময় যুবসংঘের অধীনে আসলাম। যুবসংঘের কার্যক্রম আরম্ভ করার পর কেন যেন জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ কিছুটা হিংসা করতে লাগলেন। তারপরে তো যুবসংঘকে বের করে দেয়া হ'ল। সেই ইতিহাস সকলেরই জানা। পরবর্তীতে আমরা যুবসংঘের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছি। মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমার প্রাণের সংগঠন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ গঠিত হ'ল। তখন থেকে অদ্যাবধি যুবসংঘ ও আন্দোলনকে সার্বিক সহযোগিতা করে আসছি। আরেকটা মজার ব্যাপার হ'ল আন্দোলনের সর্বোচ্চ ক্যাডার 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য' হিসাবে কেন্দ্রে গিয়ে আমরা তিনজন ভাই সর্বপ্রথম পরীক্ষা দেই। আমি, রংপুরের আব্দুল্লাহিল বাকী, যিনি মারা গেছেন। আর ঝিনাইদহের ইয়াকুব মাস্টার। এই পরীক্ষা আমীর ছাহেব নিজে নিয়েছিলেন। আমাদের দিয়েই এই বরকতী যাত্রা শুরু হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ।

সাতক্ষীরা যেলা সংগঠনে আমি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছি। সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার ক্ষেত্রে আমরা তিনজন আব্দুর রহমান মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। তন্মধ্যে আমার সন্তান সমতুল্য ছিল আমীরে জামা'আতের খুব নিকটের মানুষ আব্দুর রহমান। আরেক আব্দুর রহমান মাস্টার ছিলেন আমীরে জামা'আতের ভাগ্নি জামাই। দীর্ঘ দিন ধরে উনি ছিলেন যেলা সভাপতি আর আমি ছিলাম সহ-সভাপতি। খুবই আন্তরিকতার সাথে আমরা কাজ করেছি। যা কিছু করতাম এই তিন আব্দুর রহমান। আর একজন ছিল আমার পৃষ্ঠপোষক বা সহযোগী আমীরে জামা'আতের ভাগ্নে বদরুল আনাম। আরেকজন লোকের কথা খুব মনে পড়ে। তিনি হলেন আমীরে জামা'আতের ছোট ভগ্নীপতি জনাব লুৎফর রহমান। তিনি আমার একেবারে ছোট কালের বন্ধু ছিলেন, আবার তাওহীদ ট্রাস্টের হিসাব রক্ষকও ছিলেন। উনিও আমার খুব হিতাকাংখী ছিলেন।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা কখন এবং কিভাবে শুরু হয়?

জনাব আব্দুর রহমান : আমীরে জামা'আতের পিতা মাওলানা আহমাদ আলী আমার এক চাচার দূর সম্পর্কের মামাত শশুর হতেন। সে হিসাবে তিনি আত্মীয়ই হতেন। তারপরে আমার আব্বার নাম আহমাদ আলী, উনার নামও আহমাদ আলী। তিনি মাঝেমধ্যেই তিনি দাওয়াতী কাজে আমাদের এলাকায় আসতেন। তখন তিনি আমার আব্বাকে 'মিতা' বলে ডাকতেন। এভাবে তাঁর পরিবারের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আর সাংগঠনিক জীবনে এই ঘনিষ্ঠতায় মোহাব্বত মহান আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আমি আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকে আমীরে জামা'আতের দক্ষিণ হস্ত ছিলাম। আমার জীবন-মরণ যত দূর সাধ্য ছিল আমার সেই সাধ্য অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে চলা-ফেরা, উঠা-বসা, কাজ-কর্ম সবই করেছি। এ পর্যন্ত তাই করে আসছি। আমৃত্যু করে যাব ইনশাআল্লাহ। আমার চোখে পানি আসে, যখন তাঁর কথা ভাবি। আমি তাঁকে কি দিয়ে আমার ভালোবাসা ও সম্মান দেখাবো জানি না। আল্লাহ্র কাছে শুধু দোআই করি আল্লাহ যেন আমার আমীরে জামা'আতকে দীর্ঘজীবী করেন এবং সঠিক রাস্তায় অবিচল রেখে আমৃত্যু দ্বীনের খেদমত নেন। তাঁকে যেন মহান আল্লাহ হায়াতে তাইয়েবাহ দান করেন এবং এদেশের আহলেহাদীছ জামা'আত তাঁর দ্বারা যে আলোর সন্ধান পেয়েছে, তা যেন অব্যাহত থাকে। আমীন ছুম্মা আমীন!

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার কোন বিশেষ স্মৃতির কথা বলবেন কি?

জনাব আব্দুর রহমান : উনার সঙ্গে তো জীবনের বিরাট অংশ কেটেছে। স্মৃতির কোন অন্ত নাই। একটা ঘটনা বলি। হাফেয আখতারের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পরের ঘটনা। আমাদের নওদাপাড়া মাদরাসায় মদীনা থেকে একটি টীম আসছিল ছাত্র নেওয়ার জন্য। আমার জামাইও সেখানে পরীক্ষা দিয়েছিল। সে নির্বাচিত হয়ে গেল। এরপর থেকে সে মদীনায় থাকে। এরই মধ্যে আমার মেয়ের একটি মেয়ে হয়। তখন জামাই আমাকে বলল, আমি তো আপনার মেয়েকে এখানে আনতে চাচ্ছি। আমি বললাম, ঠিক আছে আমার কোন আপত্তি নেই। ব্যবস্থা করে দেন। ব্যবস্থা করতে গেলে তো পাসপোর্ট-ভিসা লাগবে। কোন একটি সম্মেলন কিংবা কোন সাংগঠনিক কাজে মেয়েকে নিয়ে ঢাকাতে গেলাম। তিনদিন এ্যামবেসীতে গেলাম। তিন দিনই রিজেক্ট করে দিল। মনটা খারাপ। আমীরে জামা'আত ঢাকার বংশালে ছিলাম। আমরাও বংশালে এলাম। দেখা করলাম তাঁর সাথে। তিনি বললেন, ভাই মন খারাপ কেন? তাঁকে ঘটনাটি খুলে বললাম, তিন দিন মেয়েকে নিয়ে দাঁড়ালাম। জামাই চাচ্ছে মেয়েকে ওখানে নিয়ে যেতে। কিন্তু ওরা বারবার রিজেক্ট করছে। আমীরে জামা'আত বললেন, একটা কাগজ নিয়ে আসেন। কাগজ আনলাম। উনি একটা দরখাস্ত লিখলেন আর বললেন, এই কাগজ ওদের দিবেন। ঐ দিনই মেয়েকে নিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। চিঠি দেখে ওরা আর কোন কথা বলল না। সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিয়ে দিল। এই যে একটা বড় স্মৃতি, যা আমৃত্যু মনে থাকবে। এতবড় একটা সমস্যা আল্লাহ এভাবে তাঁর হাত দিয়ে সমাধান করে দিবে, এটা অলৌকিক বললে ভুল হবে না। কারণ চিঠিটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করা হলো না, কাজ হয়ে গেল। ডেট হয়ে গেল। বলল, অমুক দিন তোমার ফ্লাইট। অবিশ্বাস্য! এমন অনেক উপকার তাঁর মাধ্যমে আমি পেয়েছি।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আত যখন ২০০৫ সালে গ্রেফতার হলেন তখন আপনি কোথায় ছিলেন এবং পরবর্তীতে কিভাবে সংগঠনের গতি সঞ্চারে ভূমিকা রেখেছিলেন?

জনাব আব্দুর রহমান : যে রাত্রে আমীরে জামা'আত গ্রেফতার হলেন সে রাত্রে বগুড়াতে আমার জামাই হাফেয আখতার

মাদানীর বাসায় ছিলাম। এর আগে থেকেই পত্র-পত্রিকায় আহলেহাদীছরা জঙ্গী মর্মে অপবাদ দেয়া হচ্ছিল। ঐ রাত্রে ১২টার পরে টিভিতে দেখাচ্ছিল যে, 'জঙ্গীনেতা' ড. গালিব গ্রেফতার। এটা দেখেতো আমার পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। এখন কি করব? এর কয়েকদিন পরে বগুড়া থেকে রাজশাহীতে আমার জামাই শামসুল আলমের বাসায় আসলাম। তারপর আমাদের করণীয় সম্পর্কে সংগঠনের দায়িত্বশীলদের সাথে পরামর্শ করতে শুরু করলাম। তারপরে কতদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। আমীরে জামাআত ছাড়া না পেলেও তাঁর বন্দীত্ব একসময় আমাদের জন্য চেতনার উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে সাড়ে তিন বছর পর তিনি মুক্তি পেলেন। কিন্তু এর ভেতর দিয়ে 'ইনছাফ পার্টি'-এর আবির্ভাব নিয়ে ক্রান্তিকাল কেটে গেল। সংগঠনের প্রধান দায়িত্বশীলদের প্রায় সকলেই ইনছাফ পার্টির পক্ষে ছিলেন। কিন্তু আমরা গুটি কয়েকজন লোক ইনছাফ পার্টির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম। আত-তাহরীক সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন অনমনীয় দৃঢ়তার সাথে আত-তাহরীকে ইনছাফ পার্টির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সম্পাদকীয় লিখলেন। তাঁর বিরুদ্ধে শোকজ করা হ'ল। আমরা শূরা মিটিং-এ উপস্থিত থেকে আত-তাহরীক সম্পাদকের সমর্থনে জোরালো ভূমিকা রাখি এবং সংগঠনের তথাকথিত রাজনৈতিক প্লাটফর্মের বিরুদ্ধে সাধ্যমত প্রতিরোধ গড়ি। আমীরে জামা'আতের সিদ্ধান্তের বাইরে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত নেয়াকে আমরা কখনই মানতে পারিনি। আমরা বলেছি তোমাদের সাথে তখনই আমরা একমত হবো যখন আমীরে জামা'আত বের হয়ে এসে সিদ্ধান্ত দেবেন। এখন জেলখানা থেকে তিনি বললেও আমরা মানব না। উনি যখন বাইরে আসবেন, তখন উনার মতামত সাপেক্ষে আমরা মতামত দিব। এভাবে সাধ্যমত উর্ধ্বতন নেতাদেরকে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করেছিলাম। পরবর্তী ইতিহাস তো সকলেরই জানা।

তাওহীদের ডাক : সে সময় সাতক্ষীরা যেলার অবস্থা কি ছিল?

জনাব আব্দুর রহমান : সেসময় আমাদের বিরুদ্ধবাদী অনেক লোক থাকলেও তারা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেনি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সবসময় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রেখেছি। আর আমীরে জামা'আত গ্রেফতার হওয়ার পর প্রথম আমরা সম্মেলন করেছি সাতক্ষীরা সিটি কলেজ ময়দানে। আমরা কারো কোন তোয়াক্কা করিনি। আমরা নির্ভীকভাবে আমাদের মনের কথা সরকারের কাছে তুলে ধরেছি। তারপরে ঢাকাতে সম্মেলন হ'ল। সেখানে আমাদেরকে পল্টন ময়দানে প্রোগ্রাম করতে দিলনা। আমরা সেই দিন মনোবল না হারিয়ে ট্রাকে মুক্তাঙ্গনে সম্মেলন করেছি। সৎ সাহসিকতার সাথে আল্লাহ কাজ নিয়েছেন। প্রতিটি কাজেই মহান আল্লাহ্র বিশেষ সহায়তা ছিল।

তাওহীদের ডাক : এবার আপনার হজ্জ স্মৃতি সম্পর্কে জানতে চাই। কিভাবে সেই যুগে হজ্জে গেলেন?

জনাব আব্দুর রহমান : আমি প্রথমে ১৯৮৫ সালে হজ্জে যাই। হজ্জে যাওয়ার জন্য টাকা জমা দিয়েছি। টাকা জমা দেওয়ার আগে আমার ছিল গ্যাস্ট্রিক, আলসার। বাংলাদেশের বহু ডাক্তার দেখিয়েছি। কিন্তু কোন কিছু হয়নি। শেষ পর্যন্ত গেলাম কুমুদিনী হাসপাতালে। ওখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলল আপনার কঠিন আলসার। অপারেশন করতে হবে। আমি বললাম, আমি তো অপারেশন করাবো না। আপনি ঔষধ দেন। খেয়ে দেখি কি হয়। ঔষধ দিল। কিন্তু খেয়ে কিছুই হয়না। শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে, ভাত খাওয়াই যেত না। খেতে হয় সাবু, বার্লি। যাই খাই বমি হয়ে যায়। পানি খেলেও বমি হয়ে যায়। এতে করে কঙ্কালসার হয়ে গেলাম। তারপরে হজ্জে যাওয়ার ডেট পড়ে গেল। তখন আমি আত্মীয় স্বজন ও দু'চার গ্রামের লোকজনকে দাওয়াত করলাম বিদায়ী দো'আ নেওয়ার জন্য। সবাই আসল এসে বলল, আপনার এ অবস্থায় হজ্জে যাওয়া ঠিক হবে না। এত কঙ্কালসার অবস্থা। আপনি কিছুই তো খেতে পারেন না। না যাওয়াই ভাল। তখন আমি বললাম আমি আপনাদের ডেকেছি আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা ও বিদায় নেওয়ার জন্য। আপনারা আমার জন্য বাঁধা সৃষ্টি করবেন না। আমার লাশটা যদি ঢাকা থেকেও ফিরে আসে তবুও নিজেকে আমার সার্থক মনে হবে। আপনারা দো'আ করে যাতে আল্লাহ আমাকে সুস্থতা দান করেন। আমি নিয়ত করেছি আল্লাহ্র ওয়াদা আছে আমার যে বান্দা এই যমযমের পানি যে নিয়তে পান করবে আমি তার সে নিয়তই পূর্ণ করব। তবে নিয়তটা ছহীহ হতে হবে এবং কোন রকম শরী'আত বিরোধী হওয়া যাবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি হজ্জে যাব। যমযমের পানি পান করব। আল্লাহ আমায় সুস্থতা দান করবেন ইনশাআল্লাহ। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেট থেকে বাহির হতেই যেন সুস্থ বোধ করতে লাগলাম। হাজী ক্যাম্পে তিনদিন থাকলাম। কিছুটা সুস্থতা বোধ করলাম। তারপর বিমানযোগে সঊদীআরব পৌঁছলাম। মক্কাতে গিয়ে বেড-পত্র রেখে তাওয়াফ করতে গেলাম। তাওয়াফ করে আল্লাহর নামে নিয়ত করে যমযমের পানি খেতে লাগলাম। পরিপূর্ণভাবে এত পানি খেলাম, কিন্তু কোন কিছুই মনে হ'ল না। সেখান থেকে আমার এখন পর্যন্ত গ্যাস্ট্রিক বা আলসার তো নেই, তারপরও কোন প্রকার পেটের অসুখও নেই আলহামদুলিল্লাহ। ১৯৮৭ সালে আব্বার অছিয়ত অনুযায়ী তাঁর বদলী হজ্জ করেছি। এরপর ২০০২ সালে সপরিবারে আম্মার বদলী হজ্জে গেলাম। এই মোট তিন বার হজ্জ করেছি।

তাওহীদের ডাক : এর পরেও কি হজ্জে গিয়েছিলেন?

জনাব আব্দুর রহমান : জী, হ্যাঁ। হজ্জে একবার গেলে তো আর লোভ সামলানো যায়না। বইতে পড়েছি, যে ব্যক্তি রামাযান মাসে ওমরাতে যাবে সে আল্লাহ্র রাসূলের সাথে হজ্জ করার সমপরিমাণ নেকী পাবে। সেই আলোকে ২০১১ সালে রামাযান মাসে ওমরাতে আল্লাহ নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর আমার মেয়ে, জামাই, নাতি-নাতনী থাকে সঊদী

আরবের আল-কাছীম অঞ্চলে। তারা আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ২০১৮ সালে ভিসা পাঠিয়ে দিল। এটাও রামাযানের আগে ছিল। ঢাকা থেকে আল-কাছীম জামাইয়ের বাসাতে পৌঁছলাম। ৩/৪ দিন পরেই রামাযানের প্রথমে সেখান থেকে একটি কাফেলার মাধ্যমে ওমরাতে চলে গেলাম। ওমরা থেকে চলে আসার কয়েকদিন পরে আমি জামাইকে বললাম, আমি রামাযানের শেষ দশক মসজিদে হারামে ইতেক্বাফ করব। আমাকে সে ব্যবস্থা করে দাও। তারপর ২০ রামাযানের আগেই মক্কাতে চলে আসলাম এবং ওমরাহ আদায় করলাম। একটা মজার ব্যাপার হ'ল এবার মক্কাতে এসে আমার স্নেহাস্পদ 'আন্দোলনে'র সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আব্দুল মান্নানের কাফেলাকে পেয়ে গেলাম। তারা রামাযানে ওমরা করার জন্য লোকজন নিয়ে এসেছে। আমি কয়েকদিন তাদের কাফেলার সাথেই থাকলাম। তারা চলে আসার পূর্বে আমি আব্দুল মান্নানকে বললাম, তোমার যে মুয়াল্লেম আছে তার সাথে আমার পরিচয় করে দিয়ে যাও, যাতে তোমরা চলে যাওয়ার পরে আমি ইতিকাফ শেষে এখানে থাকতে পারি এবং হজ্জের পূর্ব প্রস্তুতি এখান থেকেই নিতে পারি। সে বলল, ঠিক আছে চলেন। তো বাড়ির মালিকের নামও আব্দুর রহমান। আব্দুল মান্নান তাকে ফোন দিয়ে বলল, আমি আমার চাচাজীকে নিয়ে আসছি। তিনি খুবই ধনাঢ্য লোক। বাড়ী হ'ল চট্টগ্রাম। গেলাম মাগরিবের আগে সেই বাড়িতে। গিয়ে দেখি রুমের ভিতরে মেঝেতে দস্ত র খানা পেতে কত রকম যে ইফতার তৈরী করে রেখেছে! এত খাবার খাবে কে? যাক ঢুকতেই সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর নিলেন। তারপর আব্দুল মান্নান তাকে মামা বলে সম্বোধন করে বলল, উনি আমার চাচাজী হলেও আমার বাবা। আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে উনাকে আমার আব্বা হিসাবে জানি। উনি থাকবেন। হজ্জ করে যাবেন। আপনাকে একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। উনি বললেন, উনি আপনার আব্বা হলে তো আমার নানা। পরিচয় হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়ার পরে চলে আসলাম। ওরা ওমরা সেরে চলে গেল আর আমি ইতিক্বাফে বসলাম। ইতিকাফ শেষে আবার ওমরা করলাম। ওমরা শেষে জামাই ফোন দিল যে ওখান থেকে তার পরিচিত লোকজন আসছে, আমি যেন তাদের সাথে আল-কাছিমে চলে আসি। আমি তাদের সাথে জামাইয়ের বাসাতে চলে আসলাম। কিন্তু আমার প্রবল ইচ্ছা আমি হজ্জ করব। যাইহোক ২৬শে যিলক্বদ পর্যন্ত ওমরা চালু থাকে তারপর হজ্জ পর্যন্ত কিছু দিন ওমরা বন্ধ থাকে। আমি আবার ইহরাম বেঁধে মক্কা চলে গেলাম। তারপর সেই আব্দুর রহমান আমাকে এক লোক মারফত নিউ ঢাকা হোটেলে নিয়ে গেল। যাওয়ার পর সেই লোক আমাকে ৪তলা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট দেখাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমাকে দেখাচ্ছ কেন? সে বলল, আমার বস আমাকে বলে দিয়েছে নানাকে গোটা ফ্ল্যাট দেখাবে। তিনি যেটা পসন্দ করবেন সেটাই তাকে দিয়ে দিবে। আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ। তারপর সব দেখে এসে বললাম আমি নিচ তলায় থাকব। সে আমাকে ৩ বেড বিশিষ্ট একটা রুমে গিয়ে বলল এই রুমটা আপনার জন্য সম্পূর্ণ ফ্রী। এরপর আব্দুল মান্নানের হজ্জ কাফেলা আসলে তাদের সাথে যোগ দিয়ে ২০১৮ সালের হজ্জ সম্পাদন শেষ করি। ফালিল্লাহিল হামদ। এবছর মুহতারাম আমীরে জামা'আতও স্বপরিবারে হজ্জ করেন এবং মক্কায় তাঁদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। ২০২০ শেষ বারের মত হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, যা সেই আব্দুর রহমান ঠিকঠাক করে দিয়েছিল। কিন্তু করোনার কারণে সেটা করা সম্ভব হয়ে উঠল না।

তাওহীদের ডাক : আপনি সম্প্রতি আমেরিকা থেকে ফিরলেন। করোনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল সেখানে?

জনাব আব্দুর রহমান : আমার বড় ছেলে ও বউমা আমেরিকাতে গেছে ১৯৯৮ সালে। প্রথমবার আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল ২০১৬ সালে। তখন আমাকে ভিসা দিয়েছিল ৫ বছরের। ২০২১ সাল পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ আছে। প্রথমবার গিয়ে সস্ত্রীক ৩৬ দিন ছিলাম। প্রায় দিনই আমি ঘুরতে বের হতাম। মাত্র কয়েকদিনে আমেরিকার ৫টা প্রদেশ ভ্রমণ করেছি। ওয়াশিংটন, ম্যারিল্যাণ্ড, পেন্সিলভেনিয়া, নিউইয়র্ক ও নিউজার্সি। আমরা ৮টার আগে নাশতা সেরে গাড়ী নিয়ে বের হয়ে যেতাম আর রাত ১২টা বা ১টা বেজে যেত ফিরতে। আর এবারও সস্ত্রীক গেছি ২০২০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে। যাওয়ার পর কিছুদিন পরিবেশ ভালই ছিল। করোনার সংক্রমণ তখনও শুরু হয় নি। তবে তখন বাড়ী থেকে বের হওয়ার মত কোন সুযোগ ছিল না। এত ঠান্ডা। গেলেই আক্রান্ত হতে হবে নানা অসুখ-বিসুখে। এই ভয়ে আমরা বের হতে পারিনি। আমরা যাওয়ার মাস দেড়েক পর করোনা ছড়িয়ে পড়ল। লকডাউন জারি করা হ'ল। ফলে বাইরে আর বের হওয়া হ'ল না। লকডাউনের আগে আমার ছোট ছেলে ও বউমা কানাডা থেকে নিউইয়র্ক এসেছিল। তারা আমাদের খাওয়ানোর জন্য বড় বড় বোয়াল মাছ, চাঁদা মাছ, গরুর গোশত, নানা প্রকার খাবার রান্না করে নিয়ে এসেছিল। এই দেখা করে যাওয়ার পরে আমাদের ফ্লাইট ছিল যেদিন তার ৩দিন আগে লকডাউন পড়ে গেল। একারণে আমরা ওখানে আটকা পড়ে গেলাম। এরপর প্রায় ৬ মাস পর জুলাইয়ের ১৩ তারিখে বাড়িতে ফিরেছি। বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা যে কতটা অসহায় হয়ে পড়েছে করোনার কাছে, তা নিজ চোখে দেখেছি। করোনা ছাড়া অন্য রোগের কোন চিকিৎসা যেন নেই হাসপাতালে। কেউ কারো খোঁজ-খবর নেয় না। প্রতিদিনই আশ-পাশ থেকে কারো না কারো মৃত্যুসংবাদ পাই। আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা থাকলেও মৃত্যুভয় তাড়া করত। বাড়িতে কারো জ্বর এলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম আমরা। এর মধ্যে আমার স্ত্রীও কঠিন জ্বরে পড়ল। আলহামদুলিল্লাহ কিছুদিন পর সে সুস্থ হ'ল। জানালা দিয়ে কখনও রাস্তায় তাকাই। ব্যস্ত শহরে কোন যানবাহন নেই। কোথাও কেউ নেই। যেন মৃত জনপদ। সে এক অদ্ভূত অভিজ্ঞতা।

তাওহীদের ডাক : আপনার আমেরিকা সফরের বিশেষ কোন স্মৃতি সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

জনাব আব্দুর রহমান : আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকি সাধ্যমত দাওয়াতী কাজ করি। আলহামদুলিল্লাহ আমেরিকাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে বিশেষভাবে মন কেড়েছে আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি আর অফুরন্ত নে'মতরাজি। একবার আটলান্টিক মহাসাগরের মোহনায় মাছ ধরেছি। জোয়ারের সময় মহাসাগরের মোহনাগুলোতে প্রচুর মাছ উঠে। ভাটার সময় বড়শি ফেললে টপাটপ মাছ উঠে। একদিন আমার ছেলেসহ কয়েকজন গিয়েছিল তারা প্রায় দেড় মণ (৬০ কেজি) মাছ ধরতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের ধরা বড় মাছটি ছিল ৮ কেজি ওজনের, যেটা জাল দিয়ে ধরেছিল। বাকীগুলো বড়শি দিয়ে। আমি যেদিন যাই, সেদিন মাত্র ৬ কেজি মাছ পেয়েছিলাম। প্রচন্ড বৃষ্টির কারণে ফিরে আসতে হয়েছিল। তারপরে আরেকদিন গিয়েছি সেদিন বাপ-বেটা মিলে ২০কেজি মাছ পেয়েছিলাম। মাছ ধরার এই আনন্দ ভোলার মত নয়।

আমেরিকা জুড়ে গাছ-গাছালিতে ভরপুর। তবে কোন গাছেই পাতা-পুতি নেই, ন্যাড়া। মনে হবে সব গাছ মরে গেছে। হঠাৎ ফিরে আসার একমাস আগে আষাঢ় মাসের শেষের দিকে ছোট ছোট পাতা গজানোর মত ফুল বের হচ্ছে। প্রথমে ফুলগুলো ফুটে গেল তারপর পাতা বের হ'ল। এরপর সমগ্র আমেরিকা সবুজ-শ্যামলে ভরে গেল। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। নিউইয়র্কে প্রচুর আপেল বাগান দেখেছি, সেখানে আপেল খেয়েছি। খুব ভালো লাগার বিষয় হলো বিনা পয়সায় ইচ্ছামত আপেল খাওয়ার ব্যাপারটা। শুধুমাত্র একটা ব্যাগ ১৫ ডলারে কিনতে হয় তারপর যতখুশী আপেল খাওয়া অথবা ব্যাগ ভর্তি করে বাড়িতে নিয়ে আসা যায়। এছাড়া হোয়াইট হাউজসহ ওয়াশিংটনের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ফালিল্লাহিল হামদ।

তাওহীদের ডাক : আপনারা আপনাদের পরবর্তী প্রজন্ম নিয়ে কি ভাবছেন?

আব্দুর রহমান : পরবর্তী প্রজন্মকে আমি সাধ্যমত তৈরী করার চেষ্টা করেছি। ইনশাআল্লাহ যদি আল্লাহ রহম করে তো সে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আমরা আশাবাদী আমাদের চাইতেও পরবর্তী প্রজন্ম ভালো কিছু জাতিকে উপহার দিবে ইনশাআল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : যুবকদের জন্য আপনার নছীহত কি হবে?

আব্দুর রহমান : যুবকদের বলব, দেশ-বিদেশ যেখানেই যাও তোমরা কোন অবস্থাতেই বাতিলের জন্য ময়দান ছাড়বে না। হকের প্রচার ও প্রসারে কখনো পিছপা হবে না। দাওয়াতী ময়দানের তোমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে সামনে রেখে আমরা পিছনে কাজ করবো। আর্থিক বা দৈহিক যতটুকু শক্তিসামর্থ্য রয়েছে ততটুকু দিয়ে সাধ্যমত তোমাদের সাথে থাকব ইনশাআল্লাহ। যুবসংঘে'র শাখা থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত নেতাকর্মীসহ সকলকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যেন সর্বাঙ্গীন মঙ্গল দান করেন এবং যুবসংঘের কর্মতৎপরতাকে যেন গতিশীলভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাওফীক আল্লাহ দান করেন, সেই দোআই সর্বদা করি।

তাওহীদের ডাক : তাওহীদের ডাক পাঠকদের জন্য আপনার কোন উপদেশ থাকে কি?

জনাব আব্দুর রহমান : তাওহীদের ডাকের জন্য আমাদের সার্বিক দো'আ ও সহযোগিতা থাকবে। এটি 'যুবসংঘে'র একটি উপযুক্ত মুখপাত্র। এর প্রতিটি পাঠকের প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে নছীহত হল, নিজেদের আগে জানতে হবে এবং দাওয়াত দিতে হবে। সেক্ষেত্রে তাওহীদের ডাকের মত পত্রিকা সকল ব্যক্তির জন্য বিশেষত যুবকদের জন্য অবশ্য পাঠ্য।

তাওহীদের ডাক : আমাদেরকে সময় দেয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ আপনাকে হায়াতে তাইয়েবাহ দান করুন এবং আপনার প্রত্যাশা কবুল করুন- আমীন! জাযাকাল্লাহ খায়রান।

জনাব আব্দুর রহমান : তোমাদেরকেও ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ তোমাদেরকেও ছহীহ-সালামতে রাখুন। আমীন!

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

শতবর্ষ পূর্বে মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে মাওলানা আকরম খাঁ'র উপলব্ধি

[১৯৩২ সালের ১০ই ও ১১ই সেপ্টেম্বর (ভাদ্র ১৩৩৯ বাং) শনি ও রবিবার কলিকাতা আলবার্ট হলে মরহূম মাওলানা মুহাম্মাদ আকরম খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গ-আসাম প্রথম আরবী ছাত্র সম্মেলনীর প্রথম অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়। তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাষণটি রচিত হ'লেও তাতে যে সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা আজও অনুধাবনযোগ্য। বিশেষতঃ প্রচলিত আরবী শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন কেন প্রয়োজন, উক্ত শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত এবং মাদরাসায় মাতৃভাষার অনুশীলন কেন আবশ্যক, তিনি তাঁর অনুপম প্রাণবান ভাষায় এবং বৈশিষ্টমণ্ডিত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তা প্রকাশ করেছেন। প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত ছাত্র-শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাতে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাবেন। এই দুষ্প্রাপ্য অভিভাষণটি প্রথমতঃ পুরাতন সাপ্তাহিক আহলে হাদীস (৫ম বর্ষ ৩২শ, ৩৩শ, ৩৪শ ও ৩৫ সংখ্যা) হ'তে মাসিক তর্জুমানুল হাদীছে (১৫/১ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮) মুদ্রিত হয়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাওহীদের ডাক পাঠকদের জন্য তা পুনর্মুদ্রিত হ'ল। মৌলিকতা রক্ষার্থে তৎকালীন ভাষারীতি ঈষৎ পরিবর্তন সাপেক্ষে অক্ষুণ্ন রাখা হ'ল- সহকারী সম্পাদক]

বন্ধুগণ ও বৎসগণ!

এত গুণী, জ্ঞানী ও যোগ্য ব্যক্তি দেশে বর্তমান থাকিতে, আরবী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের এই মহা সম্মেলনে আমার ন্যায় একজন অনাধকারীকে সভাপতির সম্মান দেওয়ার জন্য নির্বাচন করার হেতু কি থাকিতে পারে, তাহার প্রকৃত উত্তর নির্বাচনকারী বন্ধুরাই দিতে পারেন। তবে আমার অনুমান, এই মজলিসের উদ্যোগ আয়োজনে আমার ছাত্র বন্ধুদের প্রভাব যথেষ্ট আছে এবং সম্ভবতঃ সেই হিসাবে একজন বৃদ্ধ ছাত্রের প্রতি কতকটা পক্ষপাত দেখাইতে তাঁহারা সম্ভবতঃ বাধ্য হইয়াছেন। নির্বাচনকারীদের উদ্দেশ্য ও মনোভাব যাহাই থাক না কেন, সকলকে সরল মনে বলিয়া দিতে চাই, সম্মান উপভোগ করার জন্য আমি এখানে আসি নাই, আসিয়াছি আপনাদের আদেশ পালন করার জন্য। আশা করি, আপনারা এই অধম খাদেমকে আপনাদের সহপাঠি, সহকর্মী ও সহযাত্রী জনৈক ছাত্ররূপেই গ্রহণ করিবেন এবং তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে সেই দৃষ্টিতে দর্শন করিবেন। ছাত্রদের আবরণে নিজের অযোগ্যতাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য এই শব্দগুলির আশ্রয় লই নাই। আরবী শিক্ষাকে জীবনের চরম সাধনা ও পরম সিদ্ধিরূপে গ্রহণ করার সৌভাগ্য ঘটয়াছে যাহার, বস্তুতই তাহার ছাত্রজীবনের সাধনা পরিসমাপ্ত হয় মরণের পয়গাম আসার পর। এছলামের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এ শিক্ষাও অভেদ্যরূপে শাশ্বত হইয়া আছে আমাদের প্রাণপ্রিয় মহানবীর স্বর্গীয় বাণীতে। তিনি বলিয়া দিয়েছেন- مَنْ جَاءَهُ الْمَـوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِـي الْجَنَّـةِ 'এছলামকে জীবন্ত করিয়া রাখিব এই উদ্দেশ্য লইয়া যে ব্যক্তি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয় এবং সেই অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে,... জান্নাতে তাহার অবস্থান– নবীগণের একান্তর মাত্র নিম্নে'। আসুন! আরবী শিক্ষার্থী আমরা, সকলে সকল অন্তর দিয়া আল্লাহ্‌র হুজুরে প্রার্থনা করি তাঁর প্রিয় হাবীবের নির্দেশ আনুসারে আমাদের শিক্ষা উদ্দেশ্যমুখী হউক, এছলামকে নবজীবন দানের সাধনায় সমাহিত হউক, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকুক।

আমার বক্তব্যগুলি আপনাদের খেদমতে পেশ করার পূর্ব্বে সরল অন্তঃকরণে বলিয়া রাখিতেছি- এ সম্মেলনে বিশেষজ্ঞের আসন হইতে কোন মন্তব্য করার অধিকার বা নির্দেশ দেওয়ার অভিমান আমার একটুও নাই। যে অনুভূতির তীব্র জ্বালায় আজ নবীন সৈনিকেরা পথের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়াছে, গত ৩৫ বৎসর হইতে সেই একই অনুভূতির একই জ্বালায় আমার মন ও মস্তিষ্কও জর্জরিত হইয়া আছে। আজ আপনাদের খেদমতে সেই অনুভূতিরই দুই একটা অভিব্যক্তি করিব মাত্র। তাহার সঙ্গতি-অসঙ্গতি বিচার আপনারাই করিবেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস- আজিকার এই সম্মেলনের একটা গুরুতর বিশিষ্টতা আছে, একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। আমি জানি, যুগের হুজুগের অন্ধ অনুকরণে একটা সাময়িক প্রমোদ মেলা বসান আপনাদের উদ্দেশ্য কখনই নহে। আল্লাহর মঙ্গল ইঙ্গিতে, এছলামের অভিনব জয়যাত্রার যে সব উপাদান উপকরণ দুনিয়ার দিকে দিকে দুর্ব্বার গতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে, আমার মতে সে সমস্তের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে মোছলেম জগতের আলেম সমাজে আত্মচিন্তা ও আত্মবিচারের খোদাদাদ তীব্র অনুভূতি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস- এই অনুভূতির প্রেরণাই আজ আপনাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সেই জয়যাত্রার অগ্রপথিক হিসাবে, জ্ঞানের আলোকে আপনারা নিজেদের যাত্রাপথ নির্ণয় করিয়া লইতে চান, তাই এ অনুষ্ঠান। আশা করি, সম্মেলনের সব বিচারে, সরল আলোচনায় এই প্রেরণাই আমাদের পথ প্রদর্শক হইয়া থাকিবে।

আরবী শিক্ষার্থী! আমাদের জীবনে সাধনার যে বিশিষ্টতা, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের এই আত্মবিচারের সূত্রপাত- এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে সেই সাধনার আসল লক্ষ্যটা আমাদেরকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। কারণ লক্ষ্য প্রথম নির্ণীত হইয়া না গেলে কোন কাজের সফলতা ও বিফলতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। আমার মনে হয়, আমাদের গোড়ার গলৎ হইতেছে এইখানে। এই গলতের ফলে সমাজের একদল শিক্ষিত ব্যক্তি মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, এক শ্রেণীর হিতৈষী আরবী ছাত্রদের চাকরী বাকরির সুব্যবস্থা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ

করিতেছে, সমাজের গলগ্রহ কুপোষ্য ও ভিক্ষাজীবী বলিয়া কেহ কেহ আমাদিগকে কঠোর ভাষায় অভিসম্পাৎ করিতেছেন। আর এই সব অভিমতের প্রভাবে এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে নিজেদের স্পষ্ট দৃষ্টির অভাবে, আরবী শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী আমরাও সময় সময় আবিষ্ট ও অবসন্ন হইয়া পড়ি- নিজেদের জীবনকে ব্যর্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এ সমস্তের একমাত্র কারণ এই যে, আমরা আরবী শিক্ষিতের জীবনকে বিচার করিতে যাই সে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যকে বিস্মরণ করিয়া, সে লক্ষ্যে মূল আদর্শের প্রাণবস্তু হইতে বঞ্চিত থাকিয়া। তাই এই অভিশাপ- তাই এই অপবাদ।

একটু চেষ্টা করিলে আমরা এই আদর্শের সন্ধান পাইতে পারি لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ইত্যাদি কোরআনের বাণী হইতে। দীর্ঘ চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে, দুনিয়া যখন মহাপাতকের সকল অন্ধকারে পূর্ণ ও শয়তানের সকল অভিশাপে কলুষিত- ধর্ম যখন পুরোহিতদের হাতে অত্যাচার অনাচার প্রধান উপকরণে পরিণত- বিশ্ব মানব যখন তাহার সত্যকার রব্বুল আলামীনকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত- ক্ষুব্ধ মানবতার আকুল আর্তনাদে আল্লাহ আরশ যখন বিকম্পিত- আমাদের আদর্শের প্রথম প্রকাশ হয় সেই সময়, হেরার আঁধার গুহায় রহমতুল্লিল আলামীন মোহাম্মদ মোস্তফারূপে। তিনি আসিয়াছিলেন, তাওহীদের প্রধানতম শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে, আল্লাহর আসনকে গায়রুল্লাহ্‌র সব 'তাগুতের' সমস্ত কলুষ হইতে পরিশুদ্ধ করিতে; তিনি আসিয়াছিলেন سِرَاجًا مُنِيرًا রূপে বিশ্ব মানবের মন ও মস্তিষ্কের সব অন্ধকারকে তিরোহিত করিয়া দিতে; তিনি আসিয়াছিলেন أُمَّةً وَسَطًا এর সত্য আদর্শকে লইয়া বিশ্বমানবের বর্ণগত, বংশগত, দেশগত, ধর্মগত সকল সংঘাত-সংঘর্ষের স্বর্গীয় সমাধানকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করিতে; আর তিনি আসিয়াছিলেন, بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ রূপে আত্মনিবেদিত আত্মসমর্পিত বা মোছলেম বান্দাদিগকে লইয়া এক দুর্জয় দুর্বার ও দুর্ভেদ্য সাধক সৈনিক সঙ্ঘ গঠন করিয়া দিতে।

এইসব মহান উদ্দেশ্যকে সফল করিতে জ্ঞানের, কর্মের ও ভাবের দিক দিয়া যেসব উপকরণের দরকার, তাঁহার জীবনে সেগুলি পূর্ণপরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সেই উপকরণগুলির দ্বারা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সেই মিশনকে দুনিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে জয়যুক্ত করার সাধনা তখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই, তাই দুনিয়া হইতে এন্তেকাল করার পূর্বে তিনি উম্মতকে ডাকিয়া বলিলেন- অন্য সমস্ত আম্বিয়ার ন্যায় আমাকেও দুনিয়া হইতে শীঘ্রই চিরপ্রস্থান করিতে হইবে। কিন্তু আমার আনীত শিক্ষা অমর হইয়া থাকিবে। এজন্য তোমাদের মধ্য হইতে একদল রূহানী ওয়ারেছ আমার চাই, জীবন যৌবনের যথা সর্বস্বকে সানন্দে কোরবান করিয়া আমার এই পতাকাকে দুনিয়ার দিকে দিকে জয়যুক্ত করিবে যাহারা سيد القوم خادمهم এর অনুপম নির্দেশ অনুসারে একই সঙ্গে নেতা ও খাদেমরূপে আমার উম্মতকে সকল শক্তিতে বলীয়ান ও সকল কল্যাণে গরীয়ান করিয়া রাখিবে যাহারা'। মোস্তফা কণ্ঠের সেই আহ্বান কোরআনের ভাষায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া মোছলেম জগতের প্রান্তে প্রান্তে ঘোষণা করিতেছে।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ-

এই আহ্বানগুলির সারমর্ম এই যে, বিভিন্ন অবস্থার ফলে উম্মতের সকল ব্যক্তির পক্ষে এছলামের এই খেদমতকে একমাত্র জীবন-ব্রত বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব বা সঙ্গত হইবে না। অতএব তোমাদের মধ্যে এরূপ একদল নির্বাচিত সেবক থাকা চাই, পার্থিব জীবনের বাহ্যিক সুখ সম্পদের সব মোহকে বিসর্জ্জন দিয়া যাহারা বাহির হইয়া পড়িবে আল্লাহর নাম লইয়া। প্রথমে তাহারা এছলামের শিক্ষা ও আদর্শকে নিজেদের জ্ঞানগত করিয়া আত্মগত করিয়া লইবে। তাহার পর তাহারা বাহির হইয়া পড়িবে দুনয়ার সকল দিকে, সকল প্রান্তে সেই শিক্ষা ও আদর্শকে জয়যুক্ত করিতে। একদিকে তাহাদের কর্মক্ষেত্র হইবে মোছলমান সমাজ এছলামের আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া আল্লার পতাকাকে যে তাহারা ধূলায় লুণ্ঠিত না করে। অন্যদিকে তাহারা ছুটিয়া যাইবে আল্লাহর এই বিশাল জমীনের প্রান্তে প্রান্তে, বিশ্বমানবকে মুক্তির সন্দেশ বিলাইতে। মহানবী রহমতুল্লিল আলামীনের মধ্যবর্ত্তিতার স্বর্গের যে প্রেম-পীযুষধারা মর্তে নামিয়া আসিয়াছে, বিশ্বমানবের সকল আত্মাকে তাহা দ্বারা স্নিগ্ধ করিতে, শান্ত করিতে, তৃপ্ত করিতে, কিন্তু কোরআন বলিয়া দিতেছে এ পথে কণ্টক আছে, কাঠোর অগ্নি পরীক্ষা আছে। মোহাম্মাদ মোস্তফার রূহানী ওয়ারেছ হওয়ার সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইবে যাহারা, তাহাদিগকে এই সব পরীক্ষা অতিক্রম করিতে হইবে অবিচলিত চিত্তে। এই কর্তব্য ও পরীক্ষার কথা বুঝাইয়া দেওয়ার পর বলা হইতেছে-إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ অর্থাৎ সুনির্ধারিত সুসঙ্কল্পিত অপরিহার্য্য কর্তব্য।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কর্তব্যের এই আহ্বান মোছলেম জগতের গগন পবনকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। এই দীর্ঘকালের পায়ের তলে লুটাইয়া পড়িয়াছে, কত রাজপাট তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক শ্রেণীর দীন দরিদ্র খাদেম ব্যতীত এ আহ্বানে সাড়া আর কেহই দেয় নাই। সে যাহা হউক, কোরআনের এই আহ্বানে সাড়া দিয়া

এই গুরুভার কর্তব্যকে স্বেচ্ছায় সানন্দে নিজের মাথায় তুলিয়া লওয়ার যে জীবন মরণ সঙ্কল্প তাহাই হইতেছে আরবী শিক্ষার লক্ষ্য এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আরদ্ধ সাধনাকে তাঁহার রূহানী সন্তান হিসাবে জয়যুক্ত করিয়া যাওয়ার আনন্দ হইতেছে এ লক্ষ্য-সাধনার মূল্য প্রেরণা। সুতরাং আরবী শিক্ষার জন্য নির্বাচিত হইয়াছি বলিয়া আমাদের দুঃখিত কি আনন্দিত হওয়া উচিত, এই আদর্শের আলোকে তাহার বিচার করিতে হইবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে কবির ভাষায় উত্তর দিব-

قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے + جو شخص کو جس چیز کا قابل نظر آیا

بلبل کو دیا رونا تو پروانہ کو جلنا + غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا

আরবী শিক্ষার লক্ষ্য, আদর্শ ও তাহার মূলীভূত প্রেরণা সম্বন্ধে যাহা আরজ করিয়াছি, তাহা সত্য কিনা আপনারা তাহার বিচার করিয়া দেখুন। যদি সত্য না হয়, যদি পার্সিয়ান টিচার ও ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার হওয়াই আরবী শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ বলিয়া গণ্য হয় তাহা হইলে আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ হইয়া যাইতেছে। আমার মতে সেই আরবী শিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রকার মাথা ব্যাথার দরকার আমাদের কাহারও নাই। পক্ষান্তরে ইহাই যদি আরবী শিক্ষার সত্য, সঙ্গত ও শাশ্বত আদর্শ হয়, তাহা হইলে আজ আমাদিগকে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এই আদর্শের মাপকাঠি হাতে লইয়া।

সুক্ষ্ম দৃষ্টি, ন্যায়বদ্ধ ও সৎসাহস লইয়া এই বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে আদর্শ সাধনায় আমরা আত্মদান করিয়া আসিয়াছি, তাহা যে পরিমাণে সার্থক হইয়াছে, ব্যর্থ হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে।

প্রথমে ঘরের অবস্থার হিসাব লইলে দেখা যাইবে হেফাজতে এছলামের দিক দিয়া আমাদের উদাসীনতা কতদূর মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালা ও আসামের তিন কোটি মোছলমান আজ নানা দুঃখে দুর্দশায় প্রপীড়িত, নানা পাপে নানা অনাচারে জর্জরিত, এছলামের শিক্ষা ও সাধনা হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তাহার মধ্যকার কোনটির উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিকার আমরা আজ পর্যন্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। ইংরাজী শিক্ষিত মোছলমানদিগের এক স্তরে আজ সন্দেহ ও অনাস্থার যে মারাত্মক রোগ সংক্রামক হইয়া চলিয়াছে, তাহার সুচিকিৎসার কোন প্রয়াসই আমরা পাই নাই। নানা প্রতিকূল অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের স্বাভাবিক ফলে যে সব সমস্যা মোছলেম বঙ্গের অগ্রগতিকে প্রতি পদবিক্ষেপে বাধা প্রদান করিতেছে, তাহার কোনটির সমাধান আমরা করি নাই। যুগের অলক্ষ্য প্রভাবে জাতির মন ও মস্তিষ্ক আজ যে সব অভিনব জিজ্ঞাসা দ্বারা আলোড়িত হইতেছে, তাহার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া আমরা আবশ্যক মনে করি নাই। অন্যদিকে, গত দুই শতাব্দী ধরিয়া এছলাম ধর্মের এবং মোছলেম শিক্ষা ও সভ্যতার উপর বিধর্মীদের যে অগণিত জঘন্য আক্রমণ চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিহিত উত্তর দেওয়ার বিশেষ কোন চেষ্টা আজ পর্যন্ত আমাদের দ্বারা সাধিত হয় নাই।

এইতো গেল হেফাযতে এছলামের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের উদাসীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই সঙ্গে সঙ্গে এশাআতে এছলামের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যদি আমরা নিজেদের কাজের জমা খরচ করিয়া দেখি, তাহা হইলে একটা বড় আকারের এবং অতি শোচনীয় শূন্য ব্যতীত জমার ঘরে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তওহীদের পূণ্য পীযুষধারা পান করার জন্য আল্লাহর দুনিয়া তৃষিত হইয়া আছে, কিন্তু তাহার সে তৃষ্ণা নিবারণের শক্তি বা প্রবৃত্তি কিছুই আমাদের নাই। অধিক কথা কি বলিব, পঞ্চাশ বৎসর মাত্র পূর্বে, দুর্ভিক্ষের সুযোগ অথবা মুর্খতার ফলে, বাঙ্গালার যে হাজার হাজার মোছলমান খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া গিয়াছে, মরহুম আঞ্জুমানে ওলামার দুই দিনের সামান্য চেষ্টা ব্যতীত তাহাদিগকে এছলামের পতাকাতলে ফিরাইয়া আনার কোন ব্যবস্থা আমরা করিতে পারি নাই। এ পথে যে সামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলাম, তাহা অত্যন্ত মারাত্মক। এক কথায় তাহাদের মোছলমান করার প্রধান অন্তরায় মোছলমান সমাজ নিজেরাই। এক দল মনে করে খৃষ্টান হইয়া একবার যাহাদের জাতি গিয়াছে, মোছলমান তাহারা ইচ্ছা করিলে হইতে পারে কিন্তু জাতে ওঠা তাহাদের পক্ষে আর সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক কোন্দল কোলাহলের অগ্রনায়করা মনে করেন, মানুষ মোছলমান হইয়া যদি আমাদের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ না করে তাহা হইলে তাহার কাফের থাকাই তাহা অপেক্ষা শ্রেয়। ইহা খেয়াল নহে, কল্পনা নহে- আঞ্জুমানে ওলামার সেবাকালে ইহা ছিল আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা।

বন্ধুরা! অনেক সময় জিজ্ঞাসা করেন, বৎসর বৎসর এত মৌলবী পাশ করানোর দরকার বা সার্থকতা কি আছে? শিথিলতা ও উদারতার বর্তমান অবস্থায় এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া বাস্তবিকই দুঃসাধ্য। কিন্তু আজিকার আত্মবিচারের ফলে আলেম সমাজের মধ্যে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভূতি যদি সামান্য পরিমাণেও জাগ্রত হইয়া উঠে তাহা হইলেও সমাজকে অচিরে বলিতে হইবে শত নয়, সহস্র নয়, এছলামের খেদমতের জন্য বাঙ্গলার আজ দরকার লক্ষ ধর্ম সেবক মৌলবীর। এই যে বাঙ্গলা ও আসামের পর্বত প্রান্তরকে ব্যাপ্ত করিয়া পড়িয়া আছে তোমার বিরাট কর্মক্ষেত্র সেদিকে তাকাইয়া দেখার সুযোগ কখনও পাইয়াছ কি? যদি পাইতে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে, আজই লক্ষ মৌলবীর দরকার আমাদের এছলামের অভিনব বিষয় অভিযানে। অন্যদিকে আমাদের গুরু-গম্ভীর রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরগুলি যদি সম্পূর্ণরূপে অনর্থক না হইত তাহা হইলেও এই দরকারের গুরুত্ব আমরা কতকটা বুঝিতে পারিতাম।

ان کس ست اہل بشارت کہ اشارت داند + نکتہاست بسے محرم اسرار کجاست؟

কর্তব্য সাধনা সম্বন্ধে আমাদের উদাসীনতা এবং তাহার ফলাফলের যে সংক্ষিপ্ত আভাস উপরে দিয়াছি, আপনাদের মতেও মোটের উপর তাহা যদি সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে, এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হইবে এই ব্যর্থতার প্রকৃত কারণগুলির সন্ধান লওয়ার এবং সেগুলির

প্রতিকারের উপায় আবিষ্কার করার। এখানে আমাদের দৃষ্টি যতই স্পষ্ট হইবে, প্রতিকারের উপায়গুলির ততই সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। আশাকরি, আপনারা এ সম্বন্ধে ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। এই ব্যর্থতার যে কারণগুলি আমার মনকে সততই আঘাত দিয়া থাকে তাহার মধ্যকার প্রধান কারণটি আপনাদের খেদমতে পেশ করিতেছি। আপনারা তাহার সঙ্গতি-অসঙ্গতি সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে সুখী হইব।

প্রথম কারণ :

আমাদের ব্যর্থতার প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে, নিজেদের সাধনার গুরুত্ব, নিজেদের লক্ষ্যের মহিমা এবং নিজেদের আদর্শের বিরাট স্বরূপটা আমরা হয় বুঝিতে পারি না, না হয় তাহাকে অতি হীন, অতি সঙ্কীর্ণ আকারে বিকৃত করিয়া দেখিতে শিখি। ফলতঃ মনজিল ভোলা মোছাফেরের মত একটা উদভ্রান্ত গতিমাত্রই আমাদের যাত্রার সার হইয়া দাঁড়ায় অনেক সময় মনে করি, আরবী পড়াটাই আমাদের লক্ষ্য, সুতরাং আরবী পড়ার পর, কিংকর্তব্যবিমুঢ়ের মত সংসারের চারিদিকে আঁকু বাঁকু করিয়া বেড়াই। কিন্তু আজ এই আত্মবিচারের শুভ সূত্রপাতের দিনে প্রত্যেক আরবী শিক্ষার্থী ছাত্রকে মনে প্রাণে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, আরবী পড়া মনজিলে পৌঁছিবার পথ, মনজিল উহাই নহে। লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপলক্ষ্য মাত্র, উহার লক্ষ্য নহে। সে লক্ষ্য কি, প্রথমেই তাহার আভাষ দিয়াছি। আমার স্পষ্ট অভিমত এই যে, এই লক্ষ্যের প্রেরণা হইতে বঞ্চিত যাহারা, আরবী মাদ্রাসা গুলিতে ভিড় করার কোন দরকার তাঁহাদের নাই। কলিকাতা করপোরেশনের প্রাইমারী মক্তবের শিক্ষক, হাইস্কুলের পার্সিয়ান টিচার বা ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের আবেদন পত্র হাতে লইয়া অনভিপ্রেত লোকদিগের দ্বারে দ্বারে ঘুড়িয়া বেড়াইয়া নিজেদের জীবনকে সার্থক করিয়া লইতে চান যাহারা, তাহাদের পক্ষে প্রথম হইতে অন্য পথের সন্ধান করাই কর্তব্য।

দ্বিতীয় কারণ :

সকলেই জানেন, বাঙ্গলার প্রচলিত মাদ্রাসা প্রথার প্রথম সুত্রপাত হইয়াছিল মোছলেম বঙ্গের ধ্বংস স্তুপের উপর। সত্য কথা এই যে, এইগুলির দ্বারা মোছলমানদিগকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার সামান্য একটু ইচ্ছাও তখন কর্তৃপক্ষের ছিল না এবং সেরূপ দাবীও তাহারা কোন দিন করেন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অফিস আদালতের কাজ চালাইবার জন্য কতকগুলি আমলা ও কেরানীর দরকার তাহাদের হইয়াছিল এবং সেই জন্য ওয়ারেন হেস্টিং কলিকাতা মাদ্রাসা নামে একটা বিরাট Clerk Founder সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইজন্য এইসব মাদ্রাসার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাদের দরকারী অংশের Mohammadan Law শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এছলাম শিখাইবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা সেখানে করা হয় নাই। তাই আরবী শিক্ষার মূল প্রাণবস্তু যাহা, মাদ্রাসাগুলি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হইয়াছিল এবং এখনও বহু পরিমাণে আছে।

যাহা হউক, সরকারের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা সত্বেও অল্পকালের মধ্যে ইংরাজী আসিয়া পার্সিকে নির্বাসিত করিয়া দিল, মাদ্রাসা পাশ করিয়া অফিস আদালতের চাকরী পাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহার নেছাবগুলি পূর্ববৎই রহিয়া গেল। নেছাবের কথা পরে বলিতেছি। এখানে বক্তব্য শুধু এই যে, এই সরকার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলিই মাদ্রাসার ও মাদ্রাসা শিক্ষার আদর্শকে অতি মারাত্মকভাবে বিগড়াইয়া দিয়াছে।

তৃতীয় কারণ :

আমাদের ব্যর্থতার ৩য় এবং একটা প্রধানতম কারণ হইতেছে মাদ্রাসার নেছাব বা পাঠতালিকা পূর্বেই বলিয়াছি, যে উদ্দেশ্য মাদ্রাসাগুলি প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল, অফিস আদালতের ভাষা ইংরাজী হইয়া যাওয়ার পর সেদিক দিয়া তাহার আর কোন সার্থকতা রহিল না। কিন্তু তত্রাচ তাহার নেছাব ইত্যাদি সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় বহাল রহিল এবং আজ পর্য্যন্ত তাহা বহাল হইয়া আছে। আরবী শিক্ষার্থীদের বুকের পাঁজরগুলি এই অনর্থক, আদার্শনিক ও অত্যাচারমূলক নিছাবের হাতুড়ী পিটিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করা হইতেছে যুগের পর যুগ ধরিয়া। এছলামের জ্ঞান যেখানে, তাহার আদর্শের আবেহায়াত যেখানে, মাদ্রাসার চৌহদ্দিতে তাহার প্রবেশ নিষেধ।

আরবী শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সফল করিতে হইলে বিংশ শতাব্দীর আলেমদিগকে জ্ঞানচর্চার যে সব দিকের সহিত সুপরিচিত হওয়ার দরকার, মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। এমনকি জগতের অষ্টম আশ্চর্য্য হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালার মাদ্রাসাগুলি এক শতাব্দী ধরিয়া এছলামের শিক্ষা না দিয়া আসিতেছে কোরআনকেই বর্জন করিয়া! জাতীয় ইতিহাস এমনকি হজরতের জীবনী পর্য্যন্ত মাদ্রাসার ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে পারে না। অন্যদিকে গ্রীকের গুদাম পচা মস্তেক ও ফলছফা, তামাদীযুগের অকর্মণ্য হেকমত, বর্তমান যুগের সম্পূর্ণ অনুপযোগী কালাম এবং অনাবশ্যক ব্যাকরণ প্রভৃতির দূর্বহ বোঝা আরবী শিক্ষার্থীদিগের মাথার উপর চাপাইয়া দিয়া তাহাদের সহনশীলতার পরীক্ষা করা হইতেছে। এই বোঝাগুলি বহন করিবার সময় জ্ঞানের আনন্দ বা সাহিত্যের রসতো কিছুই পাওয়াই যায় না, পক্ষান্তরে ভাবীজীবন সাধনার কোন স্তরেই ইহার কোনটিই কোন উপকারে আসিতে পারে, এরূপ আশাও কেহ করিতে পারেন না। ছাত্ররা এগুলি আয়ত্ত করিবে শুধু পরীক্ষা পাশ করার জন্য। কাজেই এই বোঝাটা বহন করিয়া চলা ছাত্রদের পক্ষে আর সম্ভবপর হইতেছে না। তাহারা বলিতেছে, ধর্মের নামকরণে আত্মহত্যা করিতে আর আমরা প্রস্তুত নহি। আরবী বিভাগের সর্ব্বসহ ছাত্রদের মধ্যে আজ যে এই বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অতি অত্যাচারের শুভ প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমিও আজ তাহাদের সঙ্গে কণ্ঠে মিশাইয়া ঘোষণা করিতেছি হয় এই অন্যায়, অনর্থক ও অত্যাচারমূলক নেছাব ধ্বংস হইবে, না হয় ঐ নেছাবের বাহনস্বরূপ মাদ্রাসাগুলি ধ্বংস হইবে। দুইটার অস্তিত্ব একসঙ্গে অধিক দিন থাকিতে পারিবে না। ইহাই হইতেছে বাঙ্গালার সহস্র সহস্র আরবী শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীর সুদৃঢ়

সঙ্কল্পের সরল ও সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। আমরা মাদ্রাসাগুলির সংস্কার চাই এবং সংস্কার অর্থে আমরা বুঝি সকল দিকের সব অনর্থের আমুল পরিবর্ত্তন। তাহার পাঠ্য তালিকা একেবারে নতুন করিয়া নির্বাচন করিতে হইবে, তাহার অধ্যাপনা প্রণালীর পরিবর্তন করিতে হইবে, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাণবস্তু স্বরূপ যে হেফাজৎ ও এশাআতে এছলাম, আরবীর ছাত্রকে তাহার উপযোগী করিয়া গঠন করিতে হইবে এই আমাদের আবেদন, এই আমাদের দাবী, এই আমাদের আলটিমেটম।

চতুর্থ কারণ :

আরবী শিক্ষিতদের জীবন সাধনা বিফল হইয়া যাওয়ার একটা বড় কারণ এই যে, আরবী শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রতিষ্ঠা ও কল কব্জার পরিচালনা ভার যাঁহাদের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হইয়া আছে, আরবী শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি তাঁহাদের অনেকেরই নাই। এমনকি আরবী শিক্ষার চরম আদর্শের ঘোর পরিপন্থী যাঁহারা, মাদ্রাসাগুলির প্রধান কর্ণধারের পদে অনেক সময় তাঁহারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বাঙ্গালায় 'ওল্ডস্কিম' মাদ্রাসাগুলির যে পরীক্ষা বোর্ড ও পরিচালনা বোর্ড আছে, তাহাতে অনেক মোছলমান সদস্য এরূপ আছেন, আরবী ভাষার সহিত যাঁহাদের কোন সম্বন্ধই নাই, হয়ত কেহ কেহ আরবী বর্ণমালার সঙ্গেও পরিচিত নহেন। আরবী শিক্ষা ও তাহার আদর্শের প্রতি উপেক্ষা বা ঘৃণার ভাব পোষণ করেন, এমন ভদ্রলোকদিগকে মাদ্রাসার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা'র আসনে বসাইয়া দিতেও কর্ত্তৃপক্ষ কুণ্ঠিত হন না। বাঙ্গালার মাদ্রাসাগুলির পক্ষে বস্তুতই ইহা একটি শোচনীয় অভিশাপে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ অঘটন সংঘটনের ফলে মাদ্রাসার সংস্কার একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যদিকে সংস্কারের নামে যাহা করা হয় তাহা-যারা কার্য্যতঃ হিতে বিপরীত উৎপত্তি ঘটিয়া দাঁড়ায়। আমি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, আরবী শিক্ষা সংস্কারের যতগুলি চেষ্টা হইয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতে আরবী শিক্ষিতদের অদৃষ্টের চূড়ান্ত ফায়ছালা করিয়াছেন তাঁহারই যাঁহারা নিজেরা আরবী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং হয়ত সহানুভূতিশূন্য।

দীর্ঘকালের পুরাতন কাহিনীগুলি পরিত্যাগ করিয়া বর্তমানের একটা টাটকা নজির দিতেছি। মোছলমানদিগের শিক্ষা সংক্রান্ত অভাব অভিযোগগুলির তদন্ত করার জন্য খান বাহাদুর মৌঃ মোহাম্মদ আবদুল মোমেন ছাহেবের সভাপতিত্বে সম্প্রতি যে তদন্ত কমিটি বসিয়াছিল তাহার কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। এই কমিটির মেম্বরগণের মধ্যে অনেকেই আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাদ্রাসার সংস্কার সংক্রান্ত বক্তব্যগুলি বুঝিতে ও তাহার বিচার করিতে সমর্থ এরূপ একজন সদস্যও তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাই নাই। সে জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার সময় এই অপ্রীতিকর সত্যটির প্রতি আমি কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। কমিটির উপস্থিত মেম্বরগণ, বিশেষতঃ তাহার সভাপতি মৌঃ আবদুল মোমেন সাহেব এই আবেদনের সম্মতি স্বীকার করেন এবং আমার প্রস্তাব মতে আরবী শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করার ও সংস্কার সম্বন্ধ Suggestion দেওয়ার জন্য তাঁহাদের অধীনে একটি সব কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করেন। সব-কমিটি গঠিত হইয়া গেল। কমিটির নোটীশ অনুসারে তাহারা মেম্বরগণ একত্র হইয়া নিজেদের প্রোগ্রামও স্থির করিয়া লইলেন। শিক্ষামন্ত্রী কমিটীর এই প্রস্তাবে মঞ্জুরী দিলেই আরবী সব-কমিটীর মেম্বারগণ জানাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা শুধু মঞ্জুরী চান। গবর্ণমেন্ট যদি মেম্বরদের বারবার দাবীর ব্যয় নাও দেন, তাহা হইলে এ সমস্ত ব্যয় তাঁহারা নিজেরাই বহন করিবেন। কিন্তু এই পর্য্যন্তই শেষ, সব-কমিটি সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য কেহই করিলেন না। এখন পূর্বোক্ত কমিটির মেম্বারগণ নিজেরাই আরবী শিক্ষার্থীদের কেছমতের ফয়ছালা করিয়া দিতেছেন। এই প্রসঙ্গে সব চাইতে নির্মম সত্য এই যে, আমাদের যে সব বন্ধু আরবী শিক্ষা-প্রণালীর ও আরবী শিক্ষিত সমাজের ব্যর্থতাকে সতত শত কণ্ঠে অভিশাপ দিতে অভ্যস্ত, সংস্কারের প্রত্যেক প্রচেষ্টায় সর্বাপেক্ষা অধিক উপেক্ষা প্রদর্শন বা বাধা প্রদান করিয়া থাকেন তাঁহারাই। ফলতঃ আরবী শিক্ষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং তাহার লক্ষ্য সম্বন্ধে সহানভূতিশূন্য ভদ্রলোকেরা মাদ্রাসাগুলির কর্ণধার হইয়া থাকাও আমাদের অধঃপাতের একটা প্রধান কারণ।

পঞ্চম কারণ :

আরবী শিক্ষিতদের জীবন সাধনার চরম ব্যর্থতার একটা প্রধানতম কারণ হইতেছে মাতৃভাষা সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা। পূর্বে দেশে দেশে যুগে যুগে স্বতন্ত্র নবী ও রছুলের আবির্ভাব হইত এবং নিজ নিজ মাতৃভাষায় তাঁহারা স্বদেশ বাসীর মধ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করিতেন। আল্লাহ বলিতেছেন- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ 'আমি প্রত্যেক রসূলকেই তাহার জাতির ভাষার মধ্য দিয়াই প্রেরণা দিয়াছি, যেন তাহারা স্বজাতিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে। আমাদের হজরত দুনিয়ার শেষ নবী এবং সকল যুগের ও সকল দেশের জন্য একমাত্র নবী। কাজেই প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক দেশের আলেমদিগের উপর এখন এই لِيُبَيِّنَ لَهُمْ এর ভার অর্পিত হইয়াছে। কোরআন স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে, মাতৃভাষার আশ্রয় ব্যতীত تبـــيين অসম্ভব। সুতরাং বাঙ্গালার তিন কোটি মোছলমানের জন্য ورثة الانبياء রূপে কাজ করিবেন যে ওলামা, এছলামকে প্রকাশ করার জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যে যথেষ্ট অধিকার অর্জন করা তাঁহাদের পক্ষে পরোক্ষভাবে ওয়াজেব। এই বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা না দিয়া মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ সহস্র সহস্র আরবী শিক্ষিতকে একেবারে বোবা বানাইয়া রাখিয়াছেন। ফলে একদিকে যেমন আরবী শিক্ষিতদের জীবন একমাত্র এই ত্রুটির জন্য বহু পরিমাণে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, অন্যদিকে অনধিকারী ব্যক্তিরা আসিয়া কর্মক্ষেত্রগুলি দখল করিয়া বসিতেছেন। এমনকি কোরআনকে পর্য্যন্ত লইয়া খেলা করিতেও আজ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকদিগের মনে কোন প্রকার দ্বিধা বা ভীতির উদ্রেক হইতেছে না।

এই অনাচারের প্রতিকার করার জন্য আরবী শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী সমাজ দীর্ঘকাল হইতে সমবেত কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে আর্ত্তনাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার কোন আবশ্যকতা আজ পর্য্যন্ত অনুভব করেন নাই। তাঁহাদের উপেক্ষা ও উদাসীনতা আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, এই সম্মেলনের সভাপতির আসন হইতে এই কথাটা আজ আমি কর্তৃপক্ষকে সসম্ভ্রমে জানাইয়া দিতেছি।

ষষ্ঠ কারণ :

মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান ব্যর্থতার আর একটা বড় কারণ হইতেছে, সেখানে مشق ومطالعة সম্বন্ধে ব্যবস্থার অভাব। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদিগকে বর্তমান যুগের অভাব অভিযোগ অনুসারে গড়িয়া তুলিতে হইলে, তাহাদিগকে গভীর গবেষণা ও স্বাধীন আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ দিতে হইবে। এজন্য প্রত্যেক মাদ্রাসায় مذاكرة علمية প্রভৃতির যথেষ্ট সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। কেবল যুদ্ধ সংক্রান্ত বহি পুস্তক পড়াইয়া দিলে কেহ সুদক্ষ সৈনিক হইতে পারে না, সেজন্য দরকার হয় প্রতিনিয়ত কুচকাওয়াজ শিক্ষা দেওয়ার। পাটী গণিতের কেতাব কণ্ঠস্থ করাইয়া কাহাকেও অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ করা যায় না, সে জন্য আবশ্যক হয় অবিরাম Exercise করিয়া যাওয়ার। ঠিক সেই রূপ research ও debating এর যথেষ্ট মশক না করিলে কেবল কয়েক খানা কেতাব কণ্ঠস্থ করিয়া কেহ এছলামের সেবা ও প্রচার করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য প্রত্যেক মাদ্রাসার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতা, মৌলিক গবেষণা এবং স্বাধীনভাবে বিচার আলোচনার সুব্যবস্থা থাকা চাই। স্বতন্ত্র পুরস্কার ও ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এমনকি, আমার মতে শেষ স্তরে এ সম্বন্ধে একটা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। বড়ই দুঃখের বিষয়, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন উৎসাহ প্রদান করেন নাই। বরং অনেকে ইহার যথাসাধ্য বাধাই দিয়া আসিয়াছেন।

এই আলোচনার এখানেই উপসংহার করিতেছি। মাদ্রাসাগুলির বর্তমান পরিস্থিতি এবং তাহার ভাবী প্রতিকার সম্বন্ধে আমার চিন্তা ও অনুভূতির একটা স্পষ্ট আভাস ইহা দ্বারা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করি। ইহা ব্যতীত বলার কথা আরো অনেক আছে। আমার মতে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রণালীর প্রত্যেক দিকটিই নানা দোষে দুষ্ট এবং আশু সংস্কার সাপেক্ষ।

বন্ধুগণ ও বৎসগণ!

আত্মবিচারের সব দিক সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি তাহার অধিকাংশ স্থলে বাহ্যতঃ দোষের বোঝা চাপান হইয়াছে অন্যের উপর। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে, এইসব দোষ ত্রুটির জন্য প্রধান অপরাধী আমরা নিজেরাই। যে স্পষ্ট দৃষ্টি এবং তীব্র অনুভূতি লইয়া আমাদিগকে এক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, নিজেদের শক্তি সামর্থের যতটা সদ্ব্যবহার করা এখানে আমাদের কর্তব্য ছিল, নিজেদিগকে আমরা তাহা হইতে ইচ্ছা পূর্বক বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি। তাই আমাদের অস্ফুট আর্তনাদ আজ পর্য্যন্ত কাহারও করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এজন্য প্রথম দরকার عَزَمْتَ বা অটুট দৃঢ় সঙ্কল্প। সঙ্কল্পের পর فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ আল্লার উপর ভরসা করিয়া কর্মসাধনা।

এ সাধনা ব্যর্থ হওয়ার নহে إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ আরবী বিভাগের যুবক ছাত্রদের কাছে আমার আর একটি আবেদন। তারুণ্য আধুনিকতা বা যুগধর্ম ইত্যাদি বলিয়া দেশে যে সব সাময়িক হুজুগের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা যেন আপনাদিগকে এছলামের صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ হইতে এক বিন্দু বিচলিত করিতে পারেনা। আপনারা আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমি আপনাদিগকে গতিহীন স্থিতিশীল স্থানু হইয়া সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ দৃষ্টির কাঠমোল্লা হইয়া থাকিতে বলিতেছিনা। এছলাম মুক্ত ধর্ম, মুক্তির ধর্ম, বন্ধনের স্থান সেখানে নাই। আমি আপনাদিগকে বলিতেছি যুগের হাওয়া অস্থায়ী, কারণ যুগই চির চঞ্চল। অন্তসারশূন্য শুষ্ক তৃণের ন্যায় এই যুগের হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইবার জন্য আমরা আসি নাই। স্মরণ রাখিবেন আমরা আসিয়াছি যুগের হাওয়া পালটাইয়া দিতে, এছলামের আদর্শ অনুসারে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিতে। এ সময় আপনাদের প্রত্যেককে এছলামের দৃঢ়চেতা সৈনিকের উপযোগীরূপে আদর্শ জীবন যাপন করিতে হইবে। আজ হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফার আদেশ ও আদর্শ যখন 'সাইনবোর্ড' বলিয়া উপহাসিত হইতেছে, সে সময় যুগের হুজুগের তাড়নায় আমরাও যদি সেই ধৃষ্টতার প্রশ্রয় দিয়া চলি, তাহার হইলে দুঃখ রাখার আর স্থান থাকে না। কোরআনের হামেল আপনারা, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সাধনার ওয়ারেছ আপনারা, এছলামের খাদেম মোজাহেদ আপনারা, জাতির সত্যকার নায়ক আপনারা, সুতরাং পদে পদে আপনাদিগকে সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। মনে রাখিবেন আধুনিকতা অন্তরের জিনিষ, হুজুগের অন্ধ অনুকরণ তাহা কখনই নহে; স্বাধীনতা মনের সদ্ভাব, স্বেচ্ছাচারের প্রগলভতা তাহা কখনই নহে; আর, বিদ্রোহ জ্ঞানের প্রেরণা মাত্র, অজ্ঞানের দাম্ভিকতা তাহা কখনই নহে। এ সমস্তের আদর্শ আমরা কোরআনের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিব, সেজন্য আমাদিগকে আর কতকগুলি অন্ধঅনুকারীর দারস্ত হইতে হইবে না।

আমি জানি, চারিদিকের সমস্ত অবস্থা আপনাদের প্রতিকূল। আমি জানি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আপনাদের প্রতি সহানূভূতিশূন্য। আমি জানি, নানা গুরুতর বাধা বিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগকে নিজেদের কর্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু বন্ধুগণ, বৎসগণ! আজ আপনাদিগকে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অবস্থা প্রতিকূল বলিয়া হতাশ হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়া আমাদের ধর্ম নহে। বরং অবস্থা যখন প্রতিকূল, তখন দ্বিগুণ দৃঢ়তা লইয়া, দ্বিগুণ সাহস লইয়া, দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া সকলে সমবেতভাবে কাজে লাগার দরকার হয় সেই সময়। এই প্রতিকূল অবস্থাকে নিজেদের ঈমান ও আমলের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে হইবে, ইহাই আমাদের সাধনা।

নারীর তিনটি ভূমিকা

-লিলবর আল-বারাদী

দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষ ও নারী জাতিকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করেছেন। আবার নারী জাতির মধ্যে সাধারণত তিনটি ভূমিকা বিরাজমান। যথা- কন্যা, স্ত্রী ও মা। একজন সুশিক্ষিতা কন্যা সন্তান থেকে যেমন আদর্শবতী ও গুণবতী স্ত্রী হয়, তেমনি সময়ের প্রেক্ষাপটে সে মায়ের ভূমিকায় রূপান্তরিত হয়। ইসলাম নারী জাতির এই তিনটি ভূমিকাকে অতীব গুরুত্বের সাথে দেখেছে। ইসলামী সমাজে নারী জাতি বলতে কন্যা, বোন, স্ত্রী, মা, খালা, ফুফু, দাসী ইত্যাদি বুঝায়। কিন্তু মৌলিকভাবে তারা তিনটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আর এই তিন ভূমিকাকে আলাদাভাবে ইসলামে সম্মানিত করা হয়েছে। 'একজন নারী যখন কন্যা সন্তান, তখন সে পিতা-মাতার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার কারণ'।[১] 'নারী যখন আদর্শবতী স্ত্রী'র দায়িত্ব পালন করে, তখন সে তার স্বামীর অর্ধেক দ্বীন পূর্ণকারী'।[২] 'আবার ঐ নারী যখন আদশবর্তী মায়ের ভূমিকাতে, তখন তার পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত থাকে'।[৩] সার্বিক বিবেচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ১৪০০ বছর পূর্বে এই তিন ভূমিকাতে নারীদের সম্মান, প্রতিপত্তি এবং প্রগতিশীল সম্মাননা একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। নিম্নে তার বিবরণ উপস্থাপন করা হ'ল।

১. প্রথম মানব-মানবী সৃষ্টির আদি কথা : প্রথম মানব-মানবী হ'লেন হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই ধরণীতে মাটি থেকে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করেন এবং তারপর তা থেকে ক্রমশঃ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এই মানব জাতি। মহান আল্লাহ্র ভাষায়, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا 'হে মানবমন্ডলী! আমরা তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরে পরিচিতি লাভ করতে পার' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

আদি মানব কি বস্তু থেকে সৃষ্টি তা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, 'কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা *(সাজদাহ ৩২/৭)*, আমি মানবকে পঁচা কাদা থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি *(হিজর ১৫/২৬)*, এঁটেল মাটি *(ছাফ্ফাত ৩৭/১১)*, পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি' *(আর-রহমান ৫৫/১৪)*।আল্লাহ তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)* এবং তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭২)* আদম একাই শুধুমাত্র মাটি থেকে সৃষ্টি। বাকী সবাই পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্ট' *(সাজদাহ ৩২/৭-৯)*।

হযরত আদম (আঃ) মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি। কিন্তু মা হাওয়া (আঃ) কি দিয়ে সৃষ্টি সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'অতঃপর তিনি তার (আদম) থেকে তার যুগল (হাওয়াকে) সৃষ্টি করেছেন' *(যুমার ৩৯/৬)*। তিনি আরও বলেন, 'তিনি তার (আদম) থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত নারী-পুরুষ' *(নিসা ৪/১)*। অন্যত্র বলেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীকে, তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন' *(রূম ৩০/২১)*।

মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)-এর পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ. 'নারী জাতিকে পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে একেবারে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। যদি তা সোজা করতে যাও, ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তা ছেড়ে দাও, তবে সব সময় বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে উত্তম ও উপদেশমূলক কথাবার্তা বলবে'।[৪]

পৃথিবীতে প্রথম মানব আদম (আঃ) মাটি থেকে এবং প্রথম মানবী হাওয়া (আঃ) আদমের পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি। এতদ্ব্যতীত সকল মানব-মানবী এক ফোঁটা অপবিত্র তরল পদার্থ (বীর্য) থেকে অদ্যাবধি সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً. 'অতঃপর আমরা তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, জমাট বাঁধা রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণ আকৃতি ও অপূর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট গোশতপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমরা নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর শিশু অবস্থায় বের করি' *(হজ্জ ২২/৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাতৃগর্ভে মানব শিশু জন্মের সন্তান সম্পর্কে এভাবে বলেছেন, إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ

---

১. *মুয়াত্তা, মিশকাত হা/৪৯৪৯।*
২. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩০৯৬; ছহীহুল জামি' হা/৪৩০, ৬১৪৮; সনদ হাসান।*
৩. *তিরমিযী; মিশকাত হা/৪৯২৭; নাসাঈ হা/৩১০৪।*
৪. *বুখারী হা/৩৩৩১; মিশকাত হা/৩২৩৮, 'বিবাহ' অধ্যায়।*

مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ .

'তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান আপন মাতৃগর্ভে বীর্যের আকারে ৪০ দিন, জমাট বাধা রক্তে পরিণত হয়ে ৪০ দিন, গোশত আকারে ৪০ দিন। এরপর আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পাঠান এবং চারটি বিষয়ে আদেশ দেন যে, তার (শিশুর) আমল, রিযিক্ব, আয়ুষ্কাল ও ভালো না মন্দ সব লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়'।[৫] অন্যত্র বলেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَمْ سَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالأَجَلُ فَيُكْتَبُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ 'আল্লাহ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করেন। ফেরেশতা বলেন, হে রব! এখনো তো ভ্রূণ মাত্র। হে রব! এখন জমাট বাঁধা রক্তপিন্ডে পরিণত হয়েছে। হে রব! এবার গোশতের টুকরায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহ যদি তাকে সৃষ্টি করতে চান, তখন ফেরেশতাটি বলেন, হে আমার রব! (সন্তানটি) ছেলে না মেয়ে হবে, পাপী না নেক্কার, রিযিক্ব কি পরিমাণ ও আয়ুষ্কাল কত হবে? অতএব এভাবে তার তাক্বদীর মাতৃগর্ভে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়'।[৬]

নারী ও পুরুষের বীর্যের সংমিশ্রণ ঘুরতে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এর চতুর্দিকে একটি আবরণের সৃষ্টি হয়। যাতে করে ভ্রূণটি ধ্বংস হ'তে না পারে। এরপর আস্তে আস্তে এক বিন্দু রক্তকণায় পরিণত হয় এবং সেই রক্তকণা গোশতপিণ্ডে অস্থিমজ্জায় পরিণত হয়, এভাবেই সৃষ্টি হয় মানব শিশু।[৭] মাতৃগর্ভে শিশুকে সংরক্ষণের জন্য মাতৃ জঠরের তিনটি পর্দা বা সন্তারের কথা কুরআনে বলা হয়েছে। যথা- পেট বা গর্ভ, রেহেম বা জরায়ু এবং ভ্রূণের আবরণ বা ভ্রূণের ঝিল্লি গর্ভফুল (Placenta)।[৮] এই তিন সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে' *(যুমার ৩৯/৬)*।

২. পুত্র-কন্যা সন্তান সৃষ্টির গূঢ় রহস্য :

নারীর গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর ২৮০ দিনের মধ্যে ১২০ দিন অতিবাহিত হ'লে পুত্র না কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তা নিশ্চিত হওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 'নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদের পুত্র-কন্যা উভয় দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*।

উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সন্তানের (ছাঃ)-এর খিদমতে উম্মে সুলাইম (রাঃ) এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ্ হক্ব কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হ'লে কি গোসল করতে হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ. 'যখন সে বীর্য দেখতে পাবে'। তখন উম্মে সালমা (লজ্জায়) তাঁর মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হয় কি?' তিনি বললেন, نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا. 'হ্যাঁ, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক! (তা না হ'লে) তাঁর সন্তান তাঁর আকৃতি পায় কিরূপে ?'[৯]

উম্মে সুলাইম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুলল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ. 'সাধারণত পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা। স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা ও হলদে। পুরুষের বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করলে পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। আবার স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করলে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়'।[১০] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, 'পুরুষ যখন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি পুরুষের বীর্য প্রথমে স্খলিত হয়, তাহ'লে সন্তান পিতার আকৃতি পায়। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রীর বীর্য প্রথমে স্খলিত হয়, তাহ'লে সন্তান মায়ের আকৃতি লাভ করে'।[১১]

আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মতে, জরায়ুতে যদি কন্যা ভ্রূণ সৃষ্টি হয়, তাহ'লে করটেক্স কম্পোন্যান্টগুলি (Cortics Componant) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'তে থাকে এবং মেডুলার কম্পোন্যান্টগুলি (Medullar Componant) কমতে থাকে। পক্ষান্তরে জরায়ুতে যদি পুত্র ভ্রূণ সৃষ্টি হয়, তাহ'লে করটেক্স কম্পোন্যান্টগুলি (Cortics Componant) কমতে থাকে এবং মেডুলার কম্পোন্যান্টগুলি (Medullar Componant) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'তে থাকে।[১২]

তাছাড়া মানুষের প্রতিটি দেহকোষে মোট ২৩ জোড়া ক্রমোজম থাকে। তন্মধ্যে ২২ জোড়া অটোজম এবং এক জোড়া সেক্স (Sex) ক্রমোজম। নারীর ডিম্বাণুতে XX ক্রমোজোম এবং পুরুষের শুক্রাণুতে XY ক্রমোজম থাকে।

---

৫. বুখারী হা/২৯৬৮, ৩০৮৬; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৬।
৬. বুখারী হা/৩০৮৭ 'কিতাবুল আম্বিয়া'।
৭. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, বিজ্ঞান না কুরআন, পৃঃ ১০৯-১১০।
৮. বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, ২৭৭পৃ., ১নং টীকা দ্রষ্টব্য।
৯. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৩।
১০. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৪।
১১. বুখারী হা/৩০৮৩ 'কিতাবুল আম্বিয়া'।
১২. গাইনিকলজি শিক্ষা, ৪১ পৃ.।

সুতরাং নারীর ডিম্বাণুর X ক্রমোজমকে যদি পুরুষের শুক্রাণুর X ক্রমোজম নিষিক্ত করে, তবে জাইগোটের ক্রমোজম হবে XX এবং কন্যা সন্তানের জন্ম হবে। পক্ষান্তরে নারীর ডিম্বাণুর X ক্রমোজমকে যদি পুরুষের শুক্রাণুর Y ক্রমোজম নিষিক্ত করে, তবে জাইগোটের ক্রমোজম হবে XY এবং পুত্র সন্তান জন্ম হবে।[১৩] মোদ্দাকথা, যখন ডিম্বাণুর ও শুক্রাণুর জাইগোটের ক্রমোজম একই গোত্রীয় (XX) হয়, তখন কন্যা সন্তান এবং যখন ডিম্বাণুর ও শুক্রাণুর জাইগোটের ক্রমোজম একই গোত্রীয় (XY) না হয়, তখন পুত্র সন্তান জন্ম নেয়।[১৪]

অতএব সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ নির্ভর করে পুরুষের দেহে উৎপন্ন শুক্রাণুর উপর। আর যমজ সন্তান জন্মদানের জন্য সবচেয়ে বেশী ভূমিকা স্ত্রীর। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, নারীর ডিম্বাশয় থেকে যখন একটি ডিম্বাণু জরায়ুতে নেমে আসে, তখন একটি শক্তিশালী শুক্রাণু তাতে প্রবেশ করে একটি সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু যদি দু'টি ডিম্বাণু জরায়ুতে নেমে আসে, তখন দু'টি শক্তিশালী শুক্রাণু তাতে আলাদা আলাদা প্রবেশ করে। ফলে যমজ সন্তানের জন্ম হয়।[১৫] এভাবেই সন্তান সৃষ্টির গূঢ় রহস্য বেরিয়ে এসেছে।

৩. প্রাক-ইসলামী যুগে কন্যা সন্তানের মর্যাদা :

প্রাক-ইসলামী আরবে নিয়ম ছিল, যদি তাদের কন্যা জন্মলাভ করত, তাহ'লে তারা কন্যা হওয়াকে নিজের জন্য অমঙ্গল ও অপমানের কারণ মনে করত। সন্তান জন্মের কিছুদিন পূর্ব থেকেই তারা মানুষের আড়াল হয়ে যেত, মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়াতো যে, জানা নেই আমার ঘরে কী সন্তান জন্মলাভ করবে। পরে যদি ছেলে সন্তান হতো এটাকে তার জন্য সম্মানের বিষয় মনে করত।

ক. কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করণ :

কন্যা সন্তানকে অমঙ্গল ও অপমানের কারণ মনে করা হতো প্রাক-ইসলামী যুগে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. 'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনোস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানী হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হ'তে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে। লক্ষ্য করো, সে কত নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল' *(নাহল ১৬/৫৮-৫৯)*। অন্যত্র বলেন, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ . 'যখন জীবন্ত-প্রথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল' *(তাক্বীর ৮১/৮-৯)*?

জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। আর এভাবে জীবন্ত কবরস্থ করা হারাম করেছে। মুগীরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপরে মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত প্রোথিতকরণ, কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করেছেন। আর তোমাদের জন্য বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক সাওয়াল করা ও সম্পদ বিনষ্ট অপছন্দ করেছেন'।[১৬]

খ. জীবন্ত প্রোথিতকরণে উভয়ে জাহান্নামী :

জীবন্তকন্যা সন্তানকে পুঁতে ফেলা ইসলাম হারাম করেছে এবং যারা বিগত দিনে এমন করেছেন তারা উভয়ে জাহান্নামী। সালামাহ বিন ইয়াজিদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, মুলায়কা নাম্নী জনৈকা মহিলার দুই ছেলে এসে তার মা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করেন যে, আমার মা জাহেলী যুগে মারা গেছেন। কিন্তু তিনি আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারীনী, অতিথিপরায়ণা এবং বিভিন্ন সৎকর্মে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের একটি বোনকে প্রোথিত করার মাধ্যমে হত্যা করেন। এমতাবস্থায় তার সৎকর্মসমূহ তার উক্ত পাপের কাফফারা হবে কি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِى النَّارِ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الإِسْلاَمَ فَيَعْفُوَ اللَّهُ عَنْهَا. 'প্রোথিতকারিণী ও প্রোথিত কন্যা উভয়ে জাহান্নামী হবে। তবে যদি প্রোথিতকারিণী ইসলাম কবুল করত তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতেন'।[১৭] অন্যত্র বলেন, الْوَائِدَةُ وَالْمَوْؤُدَةُ فِي النَّارِ. 'যে মহিলা তার কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করেছে এবং যে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হয়েছে তারা উভয়ে জাহান্নামী।[১৮]

গ. জীবন্ত প্রোথিত করণের কাফ্ফারা :

জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানের কাফ্ফারা হ'ল প্রত্যেকের জন্য একটি কওে গোলাম আযাদ করা অথবা একটি করে উট কুরবানী করা। ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, কায়েস ইবনু আছিম (ছাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জাহিলিয়াতের যুগে আমার ৮ জন কন্যাকে জীবিত প্রোথিত করেছি, এখন আমার করণীয় কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا رَقَبَةً، 'তুমি প্রত্যেকটি কন্যার বিনিময়ে একটি করে

১৩. *মাধ্যমিক সাধারণ বিজ্ঞান, জীব কোষের গঠন ও প্রকৃতি অধ্যায়, (ঢাকা : নব পুথিঘর প্রকাশনী), পৃঃ ১৬১।*
১৪. *J.N.Ghoshal, Anatomy Physcolosy, (Calcata print) P. 479.*
১৫. *গাইনিকলজি শিক্ষা, ১৫ পৃ.।*
১৬. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯১৫।*
১৭. *আহমাদ হা/১৫৯৬৫; সনদ ছহীহ।*
১৮. *আবূদাঊদ হা/৪৭১৭; মিশকাত হা/১১২; ইবনে হিব্বান হা/৭৪৮০।*

গোলাম আযাদ করে দাও। তখন কায়েস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো উটের মালিক। আমি গোলামের মালিক নই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اِهْدِ إِنْ شِئْتَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بَدَنَةً. 'তাহলে তুমি প্রত্যেকের জন্য একটি করে উট আল্লাহ্র নামে কুরবানী করে দাও'।[১৯]

ঘ. জাহেলী যুগে মহিলাদের মর্যাদা :

তৎকালীন আরবে মেয়েরা একমাত্র ভোগের সামগ্রী হিসাবে পরিগণিত হতো। বিশেষ করে ইহুদী-খৃষ্টান নারীদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং উপভোগের বস্তু হিসাবে ব্যবহার করে। নারীরা ঋতুবতী হ'লে তারা তাদেরকে ঘৃণা করে। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, ইহুদীদের কোন স্ত্রীলোকের হায়েয হ'লে তারা শুধু তাদের সাথে একত্রে খাওয়া বন্ধ করে দিতো এবং একত্রে ঘরেও থাকত না বা রাখতো না। ছাহাবীগণ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সূরা বাক্বারাহ'র ২২২ নং আয়াত অবতীর্ণ করে বলেন, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. 'আর তারা তোমাকে হায়েয সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলো, ওটা হচ্ছে অশুচি। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীলোকদেরকে অন্তরাল করো এবং উত্তম রূপে শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে গমন করো না; অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন আল্লাহ্র নির্দেশ মত তোমরা তাদের নিকট গমন করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহকারীদেরকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ. 'তাদের সাথে যৌনসঙ্গম ব্যতীত আর সব কিছু করতে পারো'। এ সংবাদ ইহুদীদের কাছে পৌঁছালে তারা বললো, এ ব্যক্তি আমাদের সব কিছুতেই বিরোধিতা না করে ছাড়তে চায় না।

অতঃপর উসায়দ ইবনু হুযাইর এবং 'আব্বাদ ইবনু বিশর (রাঃ) আসলেন এবং তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহুদীরা এসব কথা বলে বেড়ায়। আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌনসঙ্গম করার অনুমতি পেতে পারি? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তাতে আমাদের ধারণা হ'ল, তিনি তাদের ওপর রাগ করেছেন। তারপর তারা বের হয়ে গেলেন। এমন সময় তাদের সামনেই রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য কিছু দুধ হাদিয়া আসলো। অতঃপর তিনি লোক পাঠিয়ে তাদেরকে ডেকে এনে দুধ খেতে দিলেন। এতে তারা বুঝলেন যে, তিনি (ছাঃ) তাদের সাথে রাগ করেননি।[২০]

পক্ষান্তরে ইসলাম আসার পরে মুসলমানরা নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নাপাক অবস্থায় আমি ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই পাত্র হতে গোসল করতাম। তিনি আমাকে হুকুম করতেন, আমি শক্ত করে লুঙ্গি বেঁধে নিতাম, আর তিনি আমার গায়ে গা লাগাতেন অথচ তখন আমি হায়েয অবস্থায় ছিলাম। তিনি ই'তিক্বাফ অবস্থায় তাঁর মাথা মাসজিদ থেকে বের করে দিতেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় পানি দিয়ে তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম'।[২১] অন্যত্র তিনি বলেন, 'আমি হায়েয অবস্থায় পানি পান করতাম। এরপর রাসূল (ছাঃ)-কে তা দিতাম। তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখেই পানি পান করতেন। আমি কখনও হায়েয অবস্থায় হাড়ের গোশত খেয়ে নবী (ছাঃ)-কে দিতাম। তখন তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখে তা খেতেন'।[২২]

ইহুদীরা তাদের স্ত্রীদেরকে হায়েয অবস্থায় আলাদা রাখত। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তার বিপরীত মেয়েদের সম্মান দিলেন। হযরত মায়মূনা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِى مِرْطٍ، بَعْضُهُ عَلَىَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَأَنَا حَائِضٌ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি চাদরে ছালাত আদায় করতেন। যার একটি অংশ আমার শরীরের উপর থাকতো এবং অন্য অংশ তাঁর শরীরের উপর থাকতো। অথচ তখন আমি ঋতুবতী'।[২৩]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَّكِئُ فِى حَجْرِى وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. 'আমি হায়েয অবস্থায় থাকতে রাসূল (ছাঃ) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন'।[২৪] অন্যত্র তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. 'মসজিদ হ'তে আমাকে চাটাই এনে দাও'। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তিনি বললেন, إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ. 'তোমার হায়েয তো তোমার হাতে নয়'।[২৫]

যায়দ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন, জনৈক লোক সন্তানের (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হায়েয অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে কী কী করা হালাল? তখন তিনি (ছাঃ) বলেন, لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا 'তার পরনের পায়জামা শক্তভাবে বাঁধবে। তারপর উপরের দিকে যা ইচ্ছা করবে'।[২৬]

(চলবে)

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

১৯. বাযযার, ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭১৭১।
২০. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫; আহমাদ হা/১২৩৭৬; দারেমী হা/১০৫৩।
২১. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৬।
২২. মুসলিম হা/৩০০; মিশকাত হা/৫৪৭।
২৩. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫০।
২৪. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৮।
২৫. মুসলিম হা/২৯৮-৯৯, মিশকাত হা/৫৪৯; আবূদাউদ হা/২৬১।
২৬. মুয়াত্তা, দারিমী, মিশকাত হা/৫৫৫।

মধ্যযুগে ওছমানীয়রা প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করেনি কেন?

-উলুবাতলি হাসান

১৪৩৯ সালে জার্মানির স্বর্ণকার ইয়োহান গোটেনবার্গ সর্বপ্রথম প্রিন্টিংপ্রেস আবিষ্কার করেন এবং ১৪৫৫ সালে তাঁর প্রেস থেকে প্রথম বাইবেল ছাপা হয়। অন্যদিকে ১৪৫৩ সালে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ কনস্টান্টিনোপল জয় করলে বাইজান্টাইন থেকে অনেক বুদ্ধিজীবী ইউরোপে চলে যান। অর্থাৎ কনস্টান্টিনোপল বিজয় ও প্রিন্টিংপ্রেস আবিষ্কার খুবই সমসাময়িক ঘটনা। কিন্তু ওছমানীয়রা নিজেদের বই-পত্র প্রকাশে দীর্ঘদিন প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করেনি। বরং তাঁরা লিপিকারদের সনাতন পদ্ধতির উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। ফলে প্রাচ্যবিদরা তাদের এই পদক্ষেপকে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও পশ্চাদপদতার নযীর বলে ব্যাপক সমালোচনা করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওছমানীয়রা প্রিন্টিংপ্রেসের কথা জানত না নাকি ইচ্ছা করেই তারা এটি ব্যবহার করেনি? ওছমানীয় সাম্রাজ্যে কি সত্যিই প্রিন্টিং প্রেস নিষিদ্ধ ছিল? মধ্যযুগে ওছমানীয়দের প্রিন্টিং প্রেস নিয়ে মিথ, প্রিন্টিংপ্রেসের সাথে ওছমানীয়দের পতনের সম্পর্ক, আলেমদের ভূমিকা আর প্রাচ্যবিদদের মিথ্যাচার সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধে আলোকপাত করা হ'ল।

পূর্ব ও পশ্চিমের সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর প্রতি ওছমানীয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি ইউরোপিয়ান, পার্সিয়ান ও আরব চিত্রশিল্পীদের নিয়ে রাজকীয় চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রীক পান্ডুলিপিকে ওছমানীয় ভাষায় রূপান্তরের অনুমতি দেন ও ভেনিসীয় চিত্রশিল্পী বেল্লিনিকে রাজকীয় চিত্রশালায় স্থান দেন।[১] তিনি এস্ট্রোনমি অধ্যয়নকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[২] তাঁর পরবর্তী ওছমানীয় সুলতানরাও কৌশলগত প্রযুক্তি ও শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রতি সমর্থন দেয়া অব্যাহত রাখেন। সুলতান সেলিম যখন ১৫১৪ সালে তাব্রিজ জয় করেন তখন তিনি ১০০০ জন অনুচিত্রশিল্পীদের একটি দলকে রাজকীয় চিত্রশালায় নিয়ে আসেন।[৩] সুলতান ফাতিহের রাজত্বের শেষদিকে রাজকীয় পাঠশালায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই ছিল[৪] এবং তিনি নিজেও প্রিন্টিং প্রেসের সাথে পরিচিত ছিলেন। তবে কেন তিনি বা তাঁর পরবর্তী ওছমানীয় সুলতানগণ প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করেননি? এর বেশ কিছু কারণ ছিল।

প্রথমতঃ ওছমানীয় প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা নির্দিষ্ট অনুরোধ বা অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ফরমান, ফৎওয়া বা অনুমতি প্রদান করত। যেহেতু প্রত্যেক নির্দিষ্ট কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র নির্দেশ প্রদান করা হ'ত অর্থাৎ একটি ফরমানের শুধুমাত্র একটি কপিই লেখার প্রয়োজন হ'ত, অনেকগুলো কপির দরকার ছিল না। তাই প্রিন্টিং প্রেস থেকে লিপিকারের কার্যকারিতা বেশী ছিল। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ফরমানে সুলতানের স্বাক্ষর (তুগরাহ) নকল করতে স্টেনসিল ব্যবহৃত হতো।[৫] পাশাপাশি ওছমানীয় বিচারালয় ও রাজকীয় প্রাসাদে অনুলিপিকারদের একটি দল তৈরী হয়েছিল যারা দক্ষতার সাথে ফরমান লিখত ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করত। তাদের মাধ্যমে রাজকীয় ফরমান, বিচারালয়ের রায় ও রাষ্ট্রীয় স্পর্শকাতর তথ্য সংরক্ষণ করা হ'ত এবং জনসাধারণের কাছ থেকে গোপনীয়তা রক্ষা করা হ'ত, যা প্রিন্টিং প্রেসের মাধ্যমে সম্ভব ছিল না।[৬] প্রিন্টিং প্রেস যদিও একটি পান্ডুলিপি থেকে দক্ষতার সাথে অনেকগুলো কপি তৈরি করতে পারত; কিন্তু প্রত্যেক স্বতন্ত্র কপির জন্য প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করা অযৌক্তিক ছিল। সুলতান ফাতিহ থেকে সোলায়মান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট পর্যন্ত প্রায় সকল ওছমানীয় সুলতানরা ইউরোপের শহরগুলোতে অভিযান চালিয়েছেন ও জয়লাভ করেছেন। তারা যদি চাইতেন তাহলে পুরো ওছমানীয় সাম্রাজ্যে প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার শুরু করতে পারতেন। কিন্তু তৎকালীন ওছমানীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রিন্টিং প্রেস নিষ্প্রয়োজন ছিল।

দ্বিতীয়তঃ প্রথম দিকের প্রিন্টিং প্রেসে অক্ষরগুলো আলাদা আলাদা লেখা হতো। এভাবে ইংরেজি শব্দগুলো লেখা সম্ভব হলেও আরবী শব্দগুলো লেখা সম্ভব ছিল না। যেমন আরবী حسن শব্দটি প্রিন্টিং প্রেসে লিখলে ن س ح এই রকম হ'ত। তাই প্রিন্টিং প্রেসে আরবী লিখলে তা একটা বিশৃঙ্খল টেক্সট হ'ত। ফলে ওছমানীয়রা দীর্ঘদিন প্রেস ব্যবহার করেনি। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রিন্টিংপ্রেস ব্যবহারের ফরমান জারি করলেও ধর্মীয়গ্রন্থ ছাপানোর অনুমতি দেওয়া হয় নাই।[৭] আরেকটি কারণ হ'ল সুলতান সোলায়মানের পে রোল রেজিস্টার থেকে জানা যায় ১৫২৬-১৫৬৬ সালের মধ্যে

1. *Kinross, Patrick Balfour. 1977. The Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire. New York, NY:Morrow;155.*
2. *Bloom, Jonathan M. 2001. Paper Before Print: The History and Impact of Paper in the Islamic World. New Haven, CT: Yale University Press;221.*
3. *Levey, Michael. 1975. The World of Ottoman Art. London, United Kingdom: Thames and Hudson;60; Atıl, Esin. 1987. The Age of Sultan Süleyman the Magnificent. Washington, D.C.: National Gallery of Art;3.*
4. *Kreiser, Klaus. 2001. Causes of the Decrease of Ignorance? Remarks on the printing of books in the Ottoman Empire;13.*
5. *Rogers, J. M. and R. M. Ward. 1988. Süleyman the Magnificent. London, United Kingdom: British Museum Publications 8-59.*
6. *Kunt, I. Metin. 2005a. Interview with author. October 18, 2005. Amman, Jordan.*
7. *https://www.youtube.com/watch?v=4dEvEFBpVjg*

শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বেতনভুক্ত লেখক ছিল ১৪০-এরও অধিক, যারা টেক্সট লিখত ও ডিজাইন করত।[৮] সোলায়মানের শাসনামলে প্রায় দেড় লক্ষাধিক ফরমান জারি করা হয় অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছর ৩৪০০ ও প্রতিদিনে ১০টির মতো ফরমান জারি হ'ত। এর বাইরে আরো কয়েক হাযার অনুলেখক লেখা কপি করত। ইস্তাম্বুল ভ্রমণের পর ফার্নান্দো মারসিগ্লি প্রায় আশি হাজার লিপিকার ইস্তাম্বুলে কাজ করেন বলে বর্ণনা দেন।[৯] যদি প্রিন্টিং প্রেসের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হ'ত তবে লেখক ও অনুলেখকগণ বেকার হয়ে যেত। এমনকি ১৭২৭ সালে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রিন্টিংপ্রেস ব্যবহারের ঘোষণা দিলেও অনুলেখকগণ বাব-ই-আলী (সাবলাইম পোর্তে)-তে বিক্ষোভ করে।[১০]

প্রিন্টিং প্রেসের প্রতি ওছমানীয়দের ঘৃণা?

অনেক প্রাচ্যবিদরা প্রিন্টিং প্রেসের প্রতি ওছমানীয়দের ঘৃণার বিবরণ দিয়েছেন, যা নির্জলা মিথ্যাচার। ওছমানীয়রা প্রিন্টিং প্রেসকে ঘৃণা করেনি ঠিক; তবে তারা এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল।

১৪৯২ সালে খিস্টানদের স্পেনিশ রিকনকুইস্তার পর অনেক মুসলিম ও ইহুদী (সেফারদিক ইহুদী) ওছমানীয় সাম্রাজ্যে চলে আসে। ১৪৯৩ সালে সেফারদিক ইহুদীরা স্পেন ও পর্তুগাল থেকে কিনে আনা প্রিন্টিং প্রেস সর্বপ্রথম ইস্তাম্বুলে স্থাপন করে।[১১] ১৫০৪ সালে ডন ইয়াহুদা গিদালয়া নামের লিসবনের এক শরণার্থী ইস্তাম্বুলের প্রিন্টিং প্রেস থেকে তাওরাত প্রকাশ করে।[১২] ১৫২৭ সালে ইহুদী প্রকাশক সঞ্চিনো ইতালি থেকে ইস্তাম্বুলে চলে আসে ও ১৫৪৬ সালে আরবী টেক্সট হিব্রু অক্ষরে প্রকাশ করে।[১৩] ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ইস্তাম্বুলের হিব্রু প্রকাশনা শিল্প ভেনিস ও আমস্টারডামের সাথে পাল্লা দেয়া শুরু করে[১৪] এবং সতেরশো শতাব্দীর মধ্যভাগে কায়রো ও ফেজের মত ওছমানীয় শহরে হিব্রু প্রেস সফলভাবে পরিচালিত হয়।[১৫] অন্যদিকে ১৫৬৭ সালে আর্মেনীয়রা ইস্তাম্বুলে প্রিন্টিং প্রেস চালু করে ও ডোমিনিকানদের সাথে তাঁদের প্রেস শেয়ার করে, যারা পরবর্তীতে তাদের প্রকাশনার জন্য ভেনিস থেকে ল্যাটিন ফন্ট আমদানী করে।[১৬] ১৫৮৮ সালে সুলতান আহমদ একটি ফরমান জারি করে ওছমানীয় সাম্রাজ্যে ইতালীয় ব্যবসায়ীদেরকে বই বিক্রির অনুমতি দেন।

উপরের ইতিহাস থেকে বুঝা যায় প্রিন্টিং প্রেসের প্রতি ওছমানীয়দের ঘৃণা ছিল না। ওছমানীয় সুলতানগণ রাষ্ট্রীয় কাজে প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার না করলেও এটি ব্যবহারে বাধা দেননি অর্থাৎ এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান নিরপেক্ষ ছিল। প্রিন্টিং প্রেসের প্রতি ওছমানীয়দের যদি ঘৃণাই থাকত, তবে তারা তাদের সাম্রাজ্যে কোন প্রেস স্থাপন করতে দিত না। তবে প্রিন্টিং প্রেসের প্রতি ওছমানীয়দের বীতশ্রদ্ধার বেশ কিছু যৌক্তিক কারণ ছিল।

প্রথমতঃ ১৪৫৫ সালে বিখ্যাত গোটেনবার্গ বাইবেল প্রকাশেরও প্রায় এক বছর পূর্বে গোটেনবার্গ প্রেস Eine Mahnung der Christenheit wider die Türken (A warning for Christendom against the Turks) নামে একটি বই প্রকাশ করে।[১৭] যেখানে 'ওছমানীয় দখলদারিত্বের' বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ও সাইপ্রাসকে রক্ষা করতে খ্রিস্টান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে

8. Atıl, Esin. 1987. The Age of Sultan Süleyman the Magnificent. Washington, D.C.: National Gallery of Art;30-31,289-297.
9. Bloom, Jonathan M. 2001. Paper Before Print: The History and Impact of Paper in the Islamic World. New Haven, CT: Yale University Press;222; Faroqhi, Suraiya. 2000. Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire. New York, NY: I.B. Tauris Publishers; 96 ; Oman, G. 1960. ÒMatba'a.Ó In The Encyclopaedia of Islam, Vol. 6: 794-799. Leiden, The Netherlands: Brill;795.
10. https://www.dailysabah.com/feature/2015/06/08/myths-and-reality-about-the-printing-press-in-the-ottoman-empire .
11. Tamari, Ittai Joseph. 2001. Jewish printing and publishing activities in the Ottoman cities of Constantinople and Salonika at the dawn of early modern Europe.; Finkel, Caroline. 2005. Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300-1923. London, United Kingdom: John Murray;366.
12. Tamari, Ittai Joseph. 2001. Jewish printing and publishing activities in the Ottoman cities of Constantinople and Salonika at the dawn of early modern Europe, 9
13. Krek, Miroslav. 1979. The Enigma of the First Arabic book Printed from Movable Type.;209
14. Abdulrazak, Fawzi A. 1990. ÒThe Kingdom of the Book: The History of Printing as an Agency of Change in Morocco Between 1865 and 1912.Ó Ph.D. Dissertation. Boston University, 76; Tamari, Ittai Joseph. 2001. Jewish printing and publishing activities in the Ottoman cities of Constantinople and Salonika at the dawn of early modern Europe, 9.
15. Abi Farès, Huda Smitshuijzen. 2001. Arabic Typography: A Comprehensive Sourcebook. London, United Kingdom: Saqi, 65; Steinberg, S. H. 1996. Five Hundred Years of Printing. London, United Kingdom: The British Library and Oak Knoll Press, 53.
16. .Bloom, Jonathan M. 2001. Paper Before Print: The History and Impact of Paper in the Islamic World. New Haven, CT: Yale University Press, 221; Kut, Günay Alpay. 1960. ÒMatba'a: In Turkey. In The Encyclopaedia of Islam, Vol. 6: 799-803. Leiden, The Netherlands: Brill, 799.
17. Füssel, Stephan. A. 2003. Gutenberg and the Impact of Printing. Burlington, VT: Ashgate Publishing Company; Lunde, Paul. 1981. ÒArabic and the Art of Printing.Ó Saudi Aramco World, March/April 1981: 20-35; Eisenstein, — 2005. The Printing Revolution in Early Modern Europe. Second edition. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

আহ্বান জানানো হয় অর্থাৎ প্রথম থেকেই ইউরোপীয়রা প্রিন্টিং প্রেসকে ওছমানীয় অগ্রযাত্রা রুখতে ও খ্রিস্টান জাতিকে নতুন ক্রুসেডে উদ্বুদ্ধ করে।[১৮] ফলে অনেক ওছমানীয় প্রিন্টিং প্রেসকে 'ওছমানীয় খিলাফত বিরোধী' হিসাবে দেখতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ নতুন ক্রুসেডের উক্ত ঘটনাটি ওছমানীয়দেরকে প্রিন্টিং প্রেসের প্রতি চূড়ান্তভাবে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। ১৫১৪ সালে পোপ জুলিয়াসের সহায়তায় ইতালিতে প্রথম আরবী বই Kitab Salat al-Sawa'i প্রকাশিত হয়।[১৯] এর প্রায় ৩০ বছর পর ১৫৩৭ বা ১৫৩৮ সালের দিকে ভেনিসের আলেসান্দ্রো পাগানিনো সর্বপ্রথম প্রিন্টিং প্রেসে কুরআন প্রকাশ করেন। পুরো কুরআন কোন ব্যাখ্যা বা অনুবাদ ছাড়াই শুধুমাত্র টেক্সট আকারে প্রকাশিত করা ইঙ্গিত করে যে, কুরআনগুলো এক্সপোর্ট করার জন্য প্রকাশিত হয়েছে (অনেকটা মার্টিন লুথারের গণহারে বাইবেল প্রকাশের মত)।[২০] ভেনিসে ছাপানো সেই কুরআনে যবরের জায়গায় যের, পেশের জায়গায় যবর, দাল(د)-যাল(ذ) ও আইন(ع)-গাইন (غ)-এর মধ্যে ভ্রান্তি ও বিভিন্ন স্থানে অযাচিতভাবে আলিফ সংযোজনসহ অসংখ্য টেক্সচুয়াল ভুল ছিল। এমনকি ভেনিসে ছাপানো সেই কুরআনের প্রথম পৃষ্ঠাতেও ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভুল।[২১] ওছমানীয়রা যেখানে শত শত বছর ধরে পবিত্রতা ও চরম আধ্যাত্মিকতার সাথে হস্তাক্ষরে নির্ভুলভাবে কুরআন লিখতো, সেখানে প্রিন্টিংপ্রেসে তৈরী এমন বিশৃঙ্খল টেক্সট ও বিভ্রান্তিকর কুরআন দেখে তাদের অনুভূতি ছিল- 'কেবলমাত্র শয়তান স্বয়ং পবিত্র গ্রন্থের এমন কুৎসিত ও জঘন্য সংস্করণ প্রকাশ করতে পারে'।

ওছমানীয় সাম্রাজ্যে কি সত্যিই প্রিন্টিং প্রেস নিষিদ্ধ ছিল?

কিছু অসৎ প্রাচ্যবিদরা পূর্ব ও পশ্চিমে খুবই ভালোভাবে এই মিথ্যা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে (এমনকি আজ পর্যন্ত এই মিথ্যা বহাল তবিয়তে জারি আছে), 'ওছমানীয় সুলতান বায়েজিদ কর্তৃক ১৪৮৩ সালে জারিকৃত একটি ফরমানে প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন ও কেউ প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করলে মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু করেন পরবর্তীতে ১৫১৫ সালে সুলতান সেলিম এই বিধান নবায়ন করেন'।[২২] প্রাচ্যবিদরা তাদের বইয়ে সরাসরি ধারণার ভিত্তিতে বর্ণনা করেন, 'ফরমানটি স্পষ্টতঃ মুদ্রণকে নিষিদ্ধ করে'[২৩] 'ধর্মীয় অনুমতির ভিত্তিতে লেখা মুদ্রণ'[২৪] 'নির্দিষ্ট কয়েকটি ভাষায় টেক্সটের সীমাবদ্ধ মুদ্রণ'[২৫] ইত্যাদি। কিন্তু ইতিহাসের সাহায্যে আমরা প্রিন্টিং প্রেস নিয়ে মোট চারটি ফরমানের কথা জানতে পারি। সেগুলো হ'ল- দ্বিতীয় বায়েজিদ (১৪৮৩), প্রথম সেলিম (১৫১৫), তৃতীয় মুরাদ (১৫৮৮) ও তৃতীয় আহমদের (১৭২৭) ফরমান।[২৬] কিন্তু Kathryn A. Schwartz তাঁর Did Ottoman Sultans Ban Print? প্রবন্ধে বলেন, no one has claimed to have seen the firmans of Bayezid and Selim concerning print অর্থাৎ 'বায়েজিদ ও সেলিমের ফরমানগুলো কেউ দেখেছেন বলে দাবি করেননি'।[২৭] নুসহাত গেরসেক ও ওছমান এরসয় ফরমানটির 'অনিশ্চয়তা' তুলে ধরেছেন ও এর 'ঐতিহাসিক ভিত্তিহীনতা' প্রকাশ করেছেন। এমনকি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদেরও কেউ বায়েজিদ ও সেলিমের ফরমান প্রমাণ করতে পারেননি। অনেক প্রাচ্যবিদ অবশ্য বলেছেন তাদের ফরমান নাকি ইতিহাস থেকে হারিয়ে গিয়েছে!!

সাধারণতঃ সুলতান বায়েজিদ রাজকীয় কোন আইন পাশ করার পূর্বে বিতর্কের আয়োজন করতেন (অনেকটা আজকের সংসদের মতো)। কিন্তু প্রিন্টিং প্রেস নিষিদ্ধ নিয়ে তিনি কোন বিতর্কের আয়োজন করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করেননি। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল এত দীর্ঘকাল মৃত্যদন্ডের এই ফরমানটি জারি থাকলেও এই ফরমানের

18. .Eisenstein, — 2005. The Printing Revolution in Early Modern Europe. Second edition. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 303; Abdulrazak, Fawzi A. 1990. The Kingdom of the Book: The History of Printing as an Agency of Change in Morocco Between 1865 and 1912. Ph.D. Dissertation. Boston University;78.
19. .Krek, Miroslav. 1979. The Enigma of the First Arabic book Printed from Movable Type; AbiFarès, Huda Smitshuijzen. 2001. ArabicTypography: A Comprehensive Sourcebook. London, United Kingdom: Saqi, 45; Bloom, Jonathan M. 2001. Paper Before Print: The History and Impact of Paper in the Islamic World. New Haven, CT: Yale University Press,219; Pedersen, Johannes. 1984. The Arabic Book. Princeton, NJ: Princeton University Press;13.
20. Nuovo, Angela. 1990. A Lost Arabic Koran Rediscovered.Ó The Library: The Transactions of the Bibliographic Society s6-12, 4 (December 1990): 273-292.
21. Abdulrazak, Fawzi A. 1990. The Kingdom of the Book: The History of Printing as an Agency of Change in Morocco Between 1865 and 1912.Ó Ph.D. Dissertation. Boston University, 66-67; Mahdi, Mushin. 1995. From the Manuscript Age to the Age of Printed Books. In The Book in the Islamic World: The Written Word and Communication in the Middle East, edited by George N. Atiyeh, 1-15. Albany, NY: State University of New York Press.
22. https://en.wikipedia.org/wiki/Global_spreadof_the_printing_press
23. Finkel, Osman's Dream, 366.
24. Dagmar Glass and Geoffrey Roper, Part I: The Printing of Arabic Books in the Arab World, in Middle Eastern Languages and the Print Revolution: A Cross-Cultural Encounter, ed. Eva Hanebutt-Benz, Dagmar Glass, and Geoffrey Roper [Westhofen: WVAVerlag Skulima, 2002];177.
25. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey [London: Oxford University Press, 1961]; 50
26. Kathryn A. Schwartz, Did Ottoman Sultans Ban Print, 6.
27. Refer to the above-listed [40]

অধীনে মৃত্যুদণ্ড তো দূরে থাক, সাধারণ কোন অভিযোগও লিপিবদ্ধ হয়নি ।[২৮] তবে কি আদৌ 'ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাওয়া মৃত্যদন্ডের বিধান সংবলিত প্রিন্টিং প্রেস নিষিদ্ধের' এই ফরমানটি জারি করা হয়েছিলো?? সেই প্রশ্নের জবাব পাঠকদের জন্যই থাকল ।

ওছমানীয় সাম্রাজ্যে প্রিন্টিং প্রেসের প্রয়োজনীয়তাঃ

আমরা আগেই দেখেছি পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের প্রাশাসনিক কাজে প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করা 'লস প্রজেক্ট' ছিল। এর বাহিরে শিক্ষার জন্য কিছু ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তক সবার কাছেই ছিল। এছাড়া নির্দিষ্ট কিছুদিন ইস্তাম্বুলের পাবলিক লাইব্রেরী খোলা থাকত যেখান থেকে পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় টেক্সট কপি করত বা বই ধার নিত।[২৯] ফলে প্রথমদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রিন্টিং প্রেস এত প্রয়োজনীয় ছিল না।

শুধুমাত্র ইউরোপের একটা শহরে যে পরিমাণ প্রিন্টিং প্রেস ছিল গোটা ওছমানীয় সাম্রাজ্যে ততগুলো প্রিন্টিং প্রেস ছিল না। অথচ ইউরোপে প্রিন্টিং প্রেস আবিষ্কারের প্রায় ৫০ বছরের মাথায় ওছমানীয় সাম্রাজ্যে প্রিন্টিং প্রেস স্থাপিত হয়। আসলে তখন ওছমানীয় প্রিন্টিং প্রেস ছাড়াই সামগ্রিকভাবে এতো ভালোভাবে সাবলীল জীবনযাপন করছিলো যে ইউরোপিয়ানদের মতো তারা এর গুরুত্ব অনুধাবন করেনি।

১৫৮৮ সালে সুলতান মুরাদের ফরমান নিয়ে এন্টন ও বদোনি নামক দুই ব্যবসায়ী ওছমানীয় সাম্রাজ্যে আরবী, টার্কিশ ও পার্সিয়ান বই আমদানী শুরু করে। সুলতানের ফরমানের কারণে তাদের বই ওছমানীয় বন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে জব্দ হওয়া থেকে বেঁচে যায় ও তারা ওছমানীয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যবসা করার অনুমতি লাভ করে। ১৫৯৪ সালে তারা Euclid's Elements-এর আরবী সংস্করণ নিয়ে আসে ও পরবর্তীতে তারা ইবনে সিনার বিখ্যাত al-Qanun-এরও আরবী সংস্করণ আনে। কিন্তু বই দুইটি ইউরোপের তুলনায় খুব কম বিক্রি হয় ও তারা ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটি ওছমানীয়দের সামাজিক প্রেক্ষাপট, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে প্রিন্টিং বইয়ের প্রতি তাদের অনীহা প্রকাশ করে।

শুক্রু হানিয়ুগ্লু তার বইয়ে দেখান যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রিন্টিংপ্রেস ব্যবহারের ঘোষণা দেয়ার পর থেকে অর্থাৎ ১৭২৭ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে ওছমানীয় রাজকীয় প্রিন্টিং প্রেস থেকে মাত্র ১৪২টি বই প্রকাশিত হয়।[৩০] এটা প্রমাণ করে যে, ওছমানীয়দের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রিন্টিং প্রেস নিস্প্রয়োজন ছিলো। ওছমানীয়রা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এসে প্রাণবন্ত প্রিন্টিং প্রেসের উত্থানকে পুরোপুরি গ্রহণ করে।

উপরের দু'টি উদাহরণ থেকে বুঝা যায় প্রথকদিকে ওছমানীয় সাম্রাজ্যে প্রিন্টিং প্রেস খুব একটা প্রয়োজন ছিলো না। তবে শেষদিকে তারা এর জন্য কিছুটা পিছিয়ে যায়।

প্রিন্টিং প্রেস ও ধর্মীয় উন্মাদনাঃ

প্রিন্টিং প্রেস নিয়ে ওছমানীয়দের মধ্যে কোন ধর্মীয় উন্মাদনা ছিল না। তবে কুরআন বিকৃতির আশংকায় তারা দীর্ঘদিন প্রিন্টিং প্রেসে কোন ধর্মীয় গ্রন্থ ছাপায়নি। ১৫৩৮ সালের দিকে ভেনিসের প্রেসে ত্রুটিপূর্ণ কুরআন ছাপানো হ'লে ওছমানীয়দের এই আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়। প্রাচ্যবিদরা প্রিন্টিং প্রেস নিষিদ্ধের সাথে আলেমদের সম্পৃক্ততার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ভিত্তিহীন মিথ্যাচার। আদতে ওছমানীয় সাম্রাজ্যে কখনোই প্রিন্টিং প্রেস নিষিদ্ধ ছিল না। তৎকালীন শায়খুল ইসলামের ফতোয়া থেকেও প্রিন্টিং প্রেস সম্পর্কে আলেমদের মনোভাব বুঝা যায়। শায়খুল ইসলাম তাঁর ফৎওয়াতে বলেন, 'শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে মুদ্রণ শিল্পীরা খুব সহজেই অনেক বই উৎপাদন করতে পাওে, যা খুব সস্তা। যেহেতু এটি কার্যকর পদ্ধতি তাই ইসলাম এটিকে অনুমতি দেয়। বই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের উচিত প্রথমে বইটি সংশোধন করা। বই মুদ্রণের পূর্বে পর্যালোচনা করা ভালো ।

১৬৫২ সালে ওছমানীয় সাম্রাজ্যের জনৈক খ্রিষ্টান বর্ণনা করেন, তিনি প্রিন্টিং প্রেস থেকে হস্তলিপিকে বেশী প্রাধান্য দেন ও প্রিন্টিং প্রেসকে 'বিদেশী' ও 'ফ্রাঙ্কিস' হিসেবে গণ্য করেন।[৩১] এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মীয় উন্মাদনাই যদি মুসলিমদেরকে প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখত তাহলে অধিকাংশ খ্রিষ্টানরাও প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করেনি কেন? প্রিন্টিং প্রেসের ব্যাপারে রাষ্ট্রের মতো ধর্মীয় আলেমরাও ছিলেন নিরপেক্ষ। তারা যেমন অমুসলিমদের বাঁধা দেননি তেমনি নিজেরাও প্রেস ব্যবহার করেননি। তবে ওছমানীয়দের মাটিতে কেউ প্রিন্টিং প্রেসকে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেনি। এইরকম একটি ঘটনা ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করেছেন। ব্রিটিশ ও ডাচ সহায়তায় লুকারিস নামক এক ব্যক্তি ওছমানীয় সাম্রাজ্যে গ্রীক অর্থোডক্স প্রেস স্থাপন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় অর্থোডক্স শিক্ষাকে সহজ ও গতিশীল করা। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রেসটি তার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয় ও তাদের প্রকাশনায় এন্টি-ক্যাথলিসিজম ও এন্টি-সেমিটিজম প্রোপাগান্ডা শুরু হয়। এর কিছুদিন পর তারা ইসলামের সমালোচনা করে একটি লেখা প্রকাশ করে যা স্থানীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত পাশার দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে জেনেসারিরা সেই প্রেসে হামলা চালায়, সকল প্রিন্টিং উপকরণ জব্দ করে ও প্রেসটি ধ্বংস করে দেয়া হয়।[৩২]

---

28. Faroqhi, Suraiya. 2000. Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire. New York, NY: I.B. Tauris Publishers, 95.

29. Nuhoğlu, Hidayet Y. 2000. Mütefferika's Printing Press: Some Observations. In The Great Ottoman-Turkish Civilization, edited by Kemal Çiçek, Vol. 3: 83-90. Ankara, Turkey: Yeni Türkiye Publications.

30. Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton University Press (2010)

31. Faroqhi, Suraiya. 2000. Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire. New York, NY: I.B. Tauris Publishers;95

32. Runciman, Steven. 1968. The Great Church in Captivity: A Study of the Patriarchate of Constantinople from the Eve of the Turkish Conquest

ওছমানীয়দের পতনে প্রিন্টিং প্রেসের ভূমিকা :

ওছমানীয়দের পতনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য অতীতে প্রচুর গবেষণা হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। শেষদিকে ওছমানীয়রা যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়ে, তেমনি যুগ যুগ ধরে আঁকড়ে থাকা আধ্যাত্মিকতা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শেষদিকের বেশ কয়েকজন সুলতান 'ইউরোপীয়'দের মত হওয়ার জন্য ইউরোপে শিক্ষানবিশ পাঠায় যারা পরবর্তীতে তানযীমাত ও অন্যান্য সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলে। মুসলিম ঐতিহাসিকরা ওছমানীয়দের পতনের কারণ হিসাবে ইজতিহাদের অভাব, ওছমানীয় শাসন পদ্ধতি এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যকে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করতে না পারাকে দায়ী করেন। জামালুদ্দিন আফগানীর মতো সংস্কারকরা ইসলামী যুক্তিনির্ভর দর্শন ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল দমন করার জন্য ওছমানীয় শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতাকে দায়ী করেন। অন্যদিকে পশ্চিমা ঐতিহাসিক যেমন বার্নার্ড লুইস তাঁর What Went Wrong? বইয়ে 'ইসলামী সংস্কৃতির বাধা, রাজনৈতিক সেক্যুলারিজমের অনুপস্থিতি, শিল্পায়নের অভাব ও আধুনিকতাকে আলিঙ্গন করার অনীহাকে' ওছমানীয়দের পতনের জন্য দায়ী করেন।[৩৩] যদিও পরবর্তীতে তিনি তার প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সমালোচিত হন। ওছমানীয়দের পতনের কারণ হিসাবে খুব কম ঐতিহাসিকই প্রিন্টিং প্রেসকে দায়ী করেছেন। ওছমানীয়দের পতনের অনেকগুলো কারণের মধ্যে প্রিন্টিং প্রেস খুবই গৌণ একটা কারণ। আসলে ইউরোপিয়ান হেজিমনিতে ভোগা অনেকেই ইউরোপীয় ও ওছমানীয়দের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখান যে, 'ইউরোপীয়রা প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করে প্রটেস্ট্যান্ট মুভমেন্ট, এনলাইটেনমেন্ট ও শিল্প বিপ্লব সংঘটিত করে যার কারণে তারা উন্নত হয় ও ওছমানীয়রা প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার না করায় তারা পিছিয়ে পড়ে'। আসলে মূল ব্যাপারটি তা নয়। প্রটেস্ট্যান্ট মুভমেন্টের কারণে ইউরোপে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। এনলাইটেনমেন্টের মাধ্যমে সংঘটিত হওয়া ফরাসি বিপ্লব রীতিমত 'রক্তাক্ত বিপ্লবে' পরিণত হয়।

এখন প্রশ্ন হলো তাহলে ইউরোপের উন্নয়নের মূলমন্ত্রটি কি? ইউরোপের উন্নয়নের মূলমন্ত্রটি হ'ল কলোনিয়ালাইজেশন। একটা সময় ইউরোপ ওছমানীয়দের থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। কিন্তু কলোনিয়ালাইজেশনের পর থেকে তারা কলোনিগুলোকে এমনভাবে শোষণ করতে থাকে যে, অল্প কয়েক যুগের মধ্যেই তারা অর্থনৈতিক পরাশক্তি হয়ে উঠে। ফলে তারা সামরিক ও শিক্ষায় ব্যাপক বিনিয়োগ করতে থাকে যা শিল্পবিপ্লব বয়ে আনে। অন্যদিকে ওছমানীয়দের জিযিয়া, যাকাত, ওয়াকফ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইউরোপের ধারে কাছেও ছিল না। এইসব অর্থের বড় একটি অংশ আবার সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ দমন করতে ব্যয় হত। ফলে অমানবিক শোষণ ও অত্যাচারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরাশক্তি হয়ে উঠা ইউরোপের সাথে ন্যায় ও ইনছাফের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ওছমানীয়রা পাল্লা দিতে পারেনি।

পরিশেষে বলব, সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে ওছমানীয় সাম্রাজ্যে প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু প্রিন্টিং প্রেসের সাথে জড়িয়ে মুসলিম স্বর্ণযুগের রূপকার আলেম ও সুলতানদের চরিত্র হননের যে হীন প্রয়াস প্রাচ্যবিদরা শুরু করেছিল তা আজও বহাল তবিয়তে চলছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, মুসলিমরাও প্রাচ্যবিদদের সাথে এই হীন কাজে যোগ দিয়েছে।

[লেখক : নানজিং, চীন]

to the Greek War of Independence. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press;272-273; Faroqhi, Suraiya. 2000. Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire. New York, NY: I.B. Tauris Publishers;70.

33. *https://www.islamiqate.com/830/ottomanist-scholars-researchers-alleged-ottoman-decline*

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

নিভে গেল সুন্নাতের বাতিঘর
ড. মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান আল-আ'যমী

-আব্দুল হাকীম

*[অভিজাত হিন্দু ব্রাহ্মণ থেকে মুসলিম, অতঃপর অবিশ্বাস্যভাবে উম্মাহ্র খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর, 'আল-জামি' আল-কামিল ফিল হাদীছ আছ-ছহীহ আশ-শামিল'-এর সংকলক **ড. যিয়াউর রহমান আল-আ'যমী** ৯ই যিলহজ্জ ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক রোজ ৩০শে জুলাই ২০২০ যোহরের আযানের সময় আরাফার পবিত্র দিনে মদীনা মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করেন। বৈচিত্র্যময় দুনিয়ায় মহান আল্লাহ্র দূরদর্শী সৃষ্টিকৌশল বুঝার সাধ্য কার! ভারতে কট্টর হিন্দু বাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেয়া আল্লাহ্র সৃষ্টি বৈচিত্র্যের অনন্য নযীর প্রখ্যাত ও প্রতিথযশা মুহাদ্দিছ ড. যিয়াউর রহমান আ'যমী। উচ্চ বংশীয় হওয়ায় তার জীবন খুব সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই কাটছিল। একদিকে হিন্দু ধর্ম শতধাবিভক্ত, ছোট জাত-বড় জাত বাছবিচার ও নিজ ধর্মেই সুবিধা বঞ্চিত নিগৃহীত জনতার হাহাকার; অপরদিকে মুসলিম, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ পড়শী, বন্ধু-বান্ধবের জীবনাচার ও পারিপার্শ্বিকতা সুবোধ যুবক বংশীরামকে অনেকটা ভাবিয়ে তুলেছিল। তাঁর জীবনে বাধ সাধলো পাহাড়সম এই জাতপাত ধর্ম ও বর্ণ বৈষম্যের। কিভাবে তিনি সুন্নাতের বাতিঘরে পরিণত হলেন? কিভাবে তার জীবনের এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হল? পরিণত হলেন উপমহাদেশের আহলেহাদীছ কৃতী সন্তান মুসলিম উম্মাহ্র একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিছে? কিইবা ছিল তার জীবনের পিছনের গল্প? এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই পাঠক সমীপে তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল]*

নাম ও বংশপরিচয় :

হিন্দু পারিবারিক ঐতিহ্যানুযায়ী তার বাল্য নাম ছিল বঙ্কীরাম অথবা বঙ্কে লাল। হিন্দুদের অভিজাত বাহ্মণ বংশে ১৯৪৩ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় যেলার বিলারাগঞ্জ নামক গ্রামে বঙ্গে লাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ আর্য হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিল। তাঁর পিতা সমাজের একজন নেতৃপর্যায়ের ব্যক্তি ছিলেন এবং কলকাতায় তাদের বড় ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল।

শিক্ষা ও ধর্মান্তর :

তিনি হিন্দু পরিবারের সদস্য হিসাবেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যন্ত নিজ গ্রামে শিক্ষা অর্জন করার পর আযমগড় শিবলী কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৯ সালে এই কলেজের হাইস্কুল শাখা থেকে তিনি এসএসসি পাশ করেন। কলেজ পড়ুয়া মেধাবী বঙ্কে লালের মাথায় ধর্মীয় বৈষম্য ও মানুষে মানুষে ভেদনীতি দারুনভাবে ঘুরপাক খেতে থাকে, যা তাঁর মাঝে আত্মজিজ্ঞাসা ও মহাবিপ্লবের জন্ম দেয়। ফলে তিনি প্রধান প্রধান বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় কৃষ্টিকালচার নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা শুরু করেন। বাড়ির পাশের হাকিম আইয়ূব নামের এক আলেমের সাহচর্যে তিনি ইসলামের সাম্য, সৌন্দর্য ও যুগোপযোগিতায় মুগ্ধ হন। এরপর দীর্ঘ গবেষণা ও পড়াশোনার পর ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ১৮ বছর বয়সে প্রথমে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ইমামুদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে ১৬ বছর বয়সে মাধ্যমিক পাশ করেন। দেড় বছর পর তিনি এখান থেকে মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে নিজের একডেমিক ইলমী সফর শুরু করেন। তামিল নাড়ুর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান দারুস সালাম, ওমারাবাদ এ ভর্তি হন। এখানে তিনি পাঁচ বছর পড়াশোনা করেন এবং ১৯৬৬ সালে আলিম ও দাওরায়ে হাদীছ সম্পন্ন করেন।

কিন্তু হিন্দু পিতামাতা, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের অত্যাচার, নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে তিনি নামে কিছুটা পরিবর্তন করে হয়ে যান যিয়াউর রহমান আল-আ'যমী। তাঁর সহায় সম্বল সব কেড়ে নেওয়া হয়। বাড়ি থেকে তাঁর সাথে সম্পর্ক পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অবশেষে তাঁকে জানে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হয়। সর্বশেষ তিনি কোন দিশা না পেয়ে নিজ পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও মাতৃভূমি ভারত ছেড়ে পাকিস্থানে হিজরত করেন। জ্ঞান পিপাসু যিয়াউর রহমান আল-আ'যমী জামা'আতে ইসলামী পাকিস্থানের একটি মাদরাসায় ভর্তি হয়। তিনি জামা'আতে ইসলামীর আমীর আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)-এর নিকট হানাফী মাযহাবের ফিক্বহী চিন্তাধারায় দীক্ষিত হন। প্রবল আগ্রহের কারণে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়াদিতে নিজেই পড়াশোনা ও গবেষণা শুরু করেন এবং দালীলিক সমাধানের সকল দরজা তার কাছে উন্মোচিত হয়।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন :

জীবনযুদ্ধে তাঁর এই পাঠযাত্রা কখনোই স্তিমিত হয়ে যায়নি। এরপরে তাঁর উচ্চশিক্ষা অর্জনের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। বিধায় আরবীর প্রতি তাঁর ভালোবাসাটা আরো দৃঢ় হয়। তাই তিনি আরবে গিয়ে আরবী ভাষা রপ্ত করে ইলমে হাদীছ অধ্যয়নের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেন। তখন তাঁর নিকটে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ পৌঁছে। তিনি অবহিত হন যে, সেখানে আবেদনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার জন্য মনোনীত হলে তিনি সেখানে আরবী ভাষা সুন্দরভাবে শিখতে পারবেন এবং তিনি ইলমে হাদীছ অধ্যয়ন করতে পারবেন। শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই থেমে থাকেননি, ধর্মীয় জ্ঞানের প্রগাঢ় তৃষ্ণা মেটাতে এবং উচ্চতর শিক্ষা নিতে তিনি ছুটে যান প্রিয় নবীর শহর মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি নব মুসলিম হিসাবে আবেদন করেন এবং মহান আল্লাহ্র অশেষ অনুগ্রহে ১৯৬৬ সালে সেখানে অধ্যয়নের সুযোগ পান। আর তিনিই প্রথম হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিম ছাত্র, যিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পান। সেখানে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ অনুষদে ভর্তি হন এবং হাদীছ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি তৎকালীন মহান বিদ্বানদের সাহচর্য লাভ করেন। তন্মধ্যে শায়খ আব্দুল আযীয

ইবনু বায, শায়খ আশ-শানক্বিতী (রহঃ) প্রমুখ অন্যতম। তিনি তাঁর শ্রেণীতে সর্বোচ্চ রেজাল্ট করে অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ)-এর পরামর্শে আরো উচ্চতর শিক্ষার জন্য আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা করেন। তিনি মদীনা ইউনিভার্সিটির প্রথম স্নাতকদের অন্যতম যারা আল আযহার থেকে মাস্টার্স এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি শায়খ মোস্তফা আ'যমী-এর তত্ত্বাবধানে মাস্টার্স গবেষণা কর্ম সমাপ্ত করেন। মাস্টার্সে তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল 'আবূ হুরায়রা: তাঁর বর্ণনার আলোকে' [أبو هريرة: في ضوء مروياته]। তৎকালীন সময়ে যা মডারেট মুসলিম ও পাশ্চাত্যবাদীদের অভিযোগের বিরুদ্ধে এবং ছাহাবীদের সমর্থনে একটি সফল কর্ম হিসেবে সফলতা ও প্রসিদ্ধি অর্জন করে। আর তাঁর পিএইচডি গবেষণা কর্মের বিষয় ছিল 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিচারকার্য' اقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الطلاع القرطبي تحقيق تعليق واستدراك :। ১৯৭৩/৭৪ সেশনে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীছ বিভাগ খোলা হয়। ১৯৭৯ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীছ বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। কিছু সময় তিনি হাদীছ বিভাগের প্রধান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। প্রধান হিসাবে নিয়োগের জন্য তাঁর সঊদী আরবের নাগরিক হওয়ার প্রয়োজন হ'লে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইলমী সম্মাননা স্বরূপ 'রাবেতা আল-আলাম আল-ইসলামী'র প্রধান শায়খ মুহাম্মাদ বিন আলী হিরকানের সুফারিশক্রমে তাকে সঊদী সরকার সে দেশের সম্মানজনক নাগরিকত্ব প্রদান করেন, যা আসলেও খুবই সৌভাগ্যের! এছাড়াও তিনি তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে মক্কার মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগসহ বিভিন্ন শিক্ষামূলক এবং প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর মসজিদে নববীর প্রধানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি মসজিদে নববীতে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি সেখানে ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম ও সুনান আবূ দাঊদ-এর দারস প্রদান করেন। ধর্মীয় জ্ঞান চর্চার পরিমণ্ডলে এ দায়িত্ব অত্যন্ত সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ।

রচনাবলী :

এক সময়ের হিন্দু যুবক বঙ্কে লাল আজকের শায়খ যিয়াউর রহমান আল-আ'যমী গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ অনেক কাজ করেছেন। তিনি কয়েক ডজন বই লিখেছেন এবং অসংখ্য বই বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ইলমে হাদীছে তার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل এটি বারো খণ্ডে রিয়াদের দারুস সালাম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ছহীহ হাদীছগুলোকে ফিক্বহী অধ্যায় ভিত্তিক বিন্যস্ত করেছেন। এ বৃহৎ কর্মযজ্ঞে তিনি ২০০টিরও বেশী হাদীছ গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন এবং সম্ভবতঃ তিনিই পুরো দুনিয়ায় একক ব্যক্তি, যাকে দিয়ে মহান আল্লাহ এমন একটি মহৎ কাজ করিয়ে নিয়েছেন। তার অন্যতম আরেকটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে হিন্দি ভাষায় Encyclopedia of the Glorious Qur'an 'মহিমান্বিত কুরআন বিশ্বকোষ'। এছাড়াও তিনি কম্প্যারেটিভ স্টাডি অব জুদাইজম, ক্রিশ্চিয়ানিটি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান রিলিজিওন্স বিষয়েও বই লেখেন। ইসলাম গ্রহণের অভিজ্ঞতা নিয়ে খুবই সুখপাঠ্য ও মুগ্ধতা ছড়ানো আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ লিখেছেন 'ফ্রম গঙ্গা টু যমযম'।

তাঁর লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ :

১. আল জামি'উল কামিল ফিল হাদীছিছ ছহীহিশ শামিল।
২. ফুছূলুন ফি আদইয়ানিল হিন্দ [গ্রন্থটি আরবী ভাষায় রচিত। যাতে তিনি ভারতে প্রচলিত চারটি ধর্ম হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ এদের পরিচয় তুলে ধরেন]।
৩. দিরাসাতুন ফিল জারহি ওয়াত তা'দীল।
৪. আল মাদখাল ইলাস সুনানীল কুবরা লিল ইমাম বায়হাক্বী।
৫. আল মিন্নাতুল কুবরা শারহুস সুনানিস সুগরা লিল হাফিয বায়হাক্বী।
৬. মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী কর্তৃক রচিত 'ফাতহুল গাফুর ফি ওয়াযঈল আয়দী আলাস সুদূর' গ্রন্থের তাহকীক এবং ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেন।
৭. আত তামাসসুকু বিন সুন্নাহ ফিল আকাঈদি ওয়াল আহকাম।
৮. মু'জামু মুসত্বলাহিল হাদীছ ওয়া লাতায়িফিল আসানীদ।
৯. তুহফাতুল মুত্তাক্বীন ফীমা ছহহা মিনাল আদঈয়াতি ওয়াল আযকারি ওয়ার রুকা ওয়াত তিব্বি আন সায়্যিদিল মুরসালীন।
১০. আমালী ইবনু মারদুওয়ায়হ (তাহকীক কর্ম)।
১১. আল ইয়াহুদীয়্যাত ওয়ান নাসরানিয়্যাত।
১২. আর-রাযী ওয়া তাফসীরুহু।
১৩. কুরআন কে সায়ে মে।
১৪. তলোয়ারো কে সায়ে মে।
১৫. গঙ্গা সে যমযম তক।
১৬. লুগাতুল কুরআন।

আল জামি'উল কামিল ফিল হাদীছিছ ছহীহিশ শামিল পরিচিতি :

১৬৫৪৬টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা সমৃদ্ধ বিখ্যাত গ্রন্থটি মোট ১৯ খন্ডে সমাপ্ত। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ১৪৭৩৬। যা শায়েখের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কর্ম হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। ২০০১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১২ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি ছহীহ হাদীছ সংকলনের কাজ সম্পূর্ণ করেন। ২০১৬ সালে মাকতাবা দারুর রিসালা থেকে ১২খণ্ডে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর ২০১৯ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় পাকিস্তানের দার ইবনু বাশীর থেকে। বর্তমানে প্রথম খণ্ডে শুধু সূচিপত্র সংযোজিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে উছুলে হাদীছ, আসমাউর রিজাল, জারহ ওয়া তা'দীল-এর

আলোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে থাকলেও দ্বিতীয় সংস্করণে তা সবিস্তারে সংযোজন করা হয়েছে।

আল জামিউল কামিল গ্রন্থে হাদীছ সংকলনের মানহাজ : লেখক রাহিমাহুল্লাহ হাদীছ সংকলনকালে ছহীহ, হাসান, যঈফ, জাল ও মুনকার ইত্যাদি সাব্যস্ত করণের ক্ষেত্রে মুতাআখখিরীন মুহাদ্দিছগণের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি তাঁর সংকলন ফিক্বহী তারতীবে সাজিয়েছেন। গ্রন্থটি তিনি ছহীহ বুখারীর ন্যায় কিতাবুল অহী দিয়ে শুরু করেছেন। এরপর কিতাবুল ঈমান ও অন্যান্য অধ্যায় ফিক্বহী বিন্যাসানুযায়ী সাজিয়েছেন। হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হলে মুত্তাফাক্বুন আলাইহ, শুধু বুখারী বা মুসলিম গ্রন্থে হলে তাঁদের নাম ও ছহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এখানে কুতুবে সিত্তাহ ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক থেকে ছহীহ হাদীছগুলো একত্রিত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ছহীহ বুখারীর তা'লীকাত বা বালাগাত কিংবা মুয়াত্ত্বা ইমাম মালিক-এর মারাসিল সংযোজন করেননি। মূলতঃ তিনি এই সংকলনের ক্ষেত্রে হাদীছের মৌলিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন; কুতুবুয যাওয়ায়েদ-এর উপর নির্ভর করেননি। যেমন হুমায়দী-এর 'আল জামিঊ বায়নাছ ছহীহাইন' কিংবা ইবনুল আছীর-এর 'জামিঊল উছূল' থেকে হাদীছ সংকলন করেননি। এরপর তিনি কুতুবে সিত্তাহ ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক-এর বাইরে ছহীহ হাদীছ সংকলনের জন্য হায়ছামীর মাজমাঊয যাওয়ায়েদ, ইবনু হাজারের মাতালিবুল 'আলিয়া, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, সুনান সাঈদ ইবনু মানছূর, সুনান দারিমী, মুনতাকা ইবনুল জারূদ, ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ, ছহীহ ইবনু হিব্বান, দারাকুৎনী, মুসতাদরাক আল হাকিম, বায়হাক্বী থেকে ছহীহ হাদীছগুলো একত্রিত করেছেন। এছাড়াও তিনি হাদীছের নির্দিষ্ট একটি অধ্যায়; যেমন তাফসীর, আকীদাহ, আহকাম, যুহদ, দো'আ, আখলাক ইত্যাদির উপর রচিত একক মুসনাদ গ্রন্থ থেকে ছহীহ হাদীছগুলো একত্রিত করেছেন।

লেখক আল জামিঊল কামিল গ্রন্থের ভূমিকায় প্রথমেই তাঁর স্বীয় ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, সুনান আবুদাঊদ-এর একাধিক সনদ এবং যুগ শ্রেষ্ঠ গ্রহণযোগ্য ৬জন মুহাদ্দিছ থেকে তার হাদীছ বর্ণনার ইজাযাহ উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় ইলমে হাদীছের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষিপ্তকারে খুব চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে তিনি উছূলে হাদীছ ও হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছগণের মানহাজ বর্ণনা করেছেন। লেখক রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এই ছহীহ হাদীছের সংকলনের জন্য ৭টি কারণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল-

ক. মুসলিম উম্মাহর প্রাথমিক উৎস দুইটি। আল-কুরআন এবং সুন্নাহ। আমাদের সাথে আল-কুরআন রয়েছে। কিন্তু সুন্নাহ শতাধিক গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। ছহীহাইন ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যা অসংখ্য জাল ও মুনকার হাদীছের সাথে একত্রিত অবস্থায় রয়েছে। কাজেই লেখক মনে করেছেন এগুলো সংগ্রহ করে ছহীহ হাদীছগুলোকে যাচাই বাছাই করণের মাধ্যমে এক মলাটে একত্রিত করা। আবার লেখক রাহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন সময়ে সকল ছহীহ হাদীছের কোন একক সংকলন আছে কিনা এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি এর সন্তোষজনক কোন উত্তর কিংবা সংকলন না পেয়ে তিনি নিজেই এই মহান কাজের খিদমত করার জন্য এগিয়ে আসেন।

খ. বিদ'আতী ও অন্যান্য ভ্রান্ত লোক যারা হাদীছের নামে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীছ প্রচার করে তাদের বিরুদ্ধে এই ছহীহ হাদীছের বিশাল সংগ্রহশালা ঢাল হিসাবে কাজ করবে।

গ. মুসলিম উম্মাহর উছূল হলো পরস্পরের মাঝে মতপার্থক্যের সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। এক মলাটে সকল ছহীহ হাদীছ হাতের নাগালে পাওয়ার দরুণ উম্মাহর মধ্যকার মতপার্থক্যগুলো খুব সহজেই সমাধানের পথ দেখাতে সহযোগিতা করবে। বিশেষতঃ উম্মাহ মনগড়া ও ভিত্তিহীন হাদীছের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাবে। সাথে পরস্পরের মধ্যকার মত পার্থক্য হ্রাস পাবে।

ঘ. এই ছহীহ হাদীছের বিশাল সংগ্রহশালা হাদীছের যথাযথ বুঝ ও ফিক্বহুল হাদীছ অনুধাবন করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। যেমনটি ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, একটি হাদীছ অপর একটি হাদীছের ব্যাখ্যাস্বরূপ।

ঙ. ইলমে হাদীছের ছাত্রদের জন্য এই ছহীহ হাদীছের সংকলন অপরিসীম উপকার প্রদান করবে। বিশেষ করে এর মাধ্যমে খুব সহজেই জাল ও মুনকার হাদীছ থেকে ছহীহ হাদীছগুলো পার্থক্য করতে সক্ষম হবে। এছাড়া হাদীছের হুকুম সহজেই বুঝতে পারবে। হাদীছটি তারগীব নাকি তারহীব কিংবা হাদীছের প্রদত্ত ফায়েদা খুব সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে। ইলমে হাদীছের এই মহান বিদ্বান যে খিদমাত করেছেন তা জাতি চিরদিন স্মরণ করবে।

মৃত্যু :

ইলমে হাদীছের এই মহান ব্যক্তিত্ব ও মহীরুহ গত ৩০ জুলাই মোতাবেক ৯ জিলহজ আরাফার দিনে মদীনা মুনাওয়ারাতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। বাদ মাগরিব মসজিদে নববীতে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বাক্বীউল আল-গারক্বাদ কবরস্থানে নবী পরিবারের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

বছরের সর্বোত্তম (ذلك اليوم المشهود) দিন আরাফার মোবারক দিনে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। অমুসলিম পরিবারে জন্ম লাভ করেও যে সকল মনীষী ইসলাম গ্রহণ করে ইলমের বিভিন্ন শাখায় অবদান রেখেছেন তাদের মাঝে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার মত একটি নাম ড. মুহাম্মদ যিয়াউর রহমান আল-আ'যমী। মানুষ তার কর্মে বেঁচে থাকে, বংশ পরিচয়ে নয়। তিনি প্রকৃতপক্ষেই 'ইমামুদ্দীন' বা দ্বীনের নেতা হিসাবে যুগ যুগ ধরে বরিত হতে থাকবেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাঊস নছীব করুন- আমীন!

[লেখক : অধ্যায়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব]

একমাত্র ইসলামই পারে আপনার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করতে!

-হিদার শাহ

[লেখক হিদার শাহ হলেন আমেরিকান নও মুসলিম। বর্তমানে তিনি মিশরে থাকেন যেখানে তিনি পেশাদার অনুবাদক এবং আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজের খণ্ডকালীন শিক্ষক। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা ও ইসলামিক স্টাডিজে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন।]

একটি ধর্মীয় পরিবারে বড় হয়ে উঠার কিছু সুবিধা সবসময়ই থাকে। আমিও এর বাইরে নই। আমার বেড়ে উঠা একটি ধার্মিক খ্রিষ্টান পরিবারে। যার কারনে খুব ছোট বেলা থেকেই ধর্মের বিভিন্ন রীতিনীতি এবং বিশ্বাসের সাথে পরিচিত আমি। আমি নিজেও পালন করতাম এবং সেই ছোট বয়সেই গীর্জায় অন্য বাচ্চাদের ধর্ম শিক্ষা দান করতাম। বাড়িতে টেলিভিশন ছিল না আমাদের। ফলস্বরূপ, হাতের অঢেল সময় পার করার জন্য পড়াশুনাকে বেছে নিলাম। আমি সব ধরনের বই পড়তাম, সাথে ধর্মীয় বইও। যখন আমার বয়স বারো তখন আমার সন্দেহ শুরু হয়ে যায় আমি যে বিশ্বাসের উপর আছি সেটা সঠিক কিনা। চৌদ্দতে পা দিয়ে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে

পারলাম যে, এটি সত্য হতে পারে না। সেইসাথে আমি এমন কিছু খুঁজেও পাচ্ছিলাম না যেটা কিনা আমার বর্তমান বিশ্বাসের জায়গাতে আসতে পারে। ঠিক তখন থেকেই আমি আমার জানামতে যেসব সত্যবাদী ধর্ম ছিল সেগুলো সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু করলাম। আমি একটি কাঠামো দাঁড় করাতে চাইলাম। এই কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ উপাদান ছিল, যাকে আমরা সত্য ধর্ম বলে জানব সেটা অবশ্যই মানুষের প্রথম জ্ঞান হিসাবে বিবেচ্য হবে। এটি যখন পড়া হবে তখন সেটা হৃদয়গ্রাহী হবে এবং সেইসাথে এর প্রত্যেকটি কথা হবে মানুষের জীবন নির্ভর। যা মানুষকে দিবে জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো এটি এক ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করবে। কিন্তু আমি হতাশ হয়ে দেখলাম আমার তৈরি করা কাঠামোর ভেতর কোন ধর্মই আসল না। ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি ইসলাম ধর্ম খ্রিষ্ট ধর্মের পরে এসেছিল। এই ভুল ধারণার কারনে আমার কখনো ইসলামকে জানার আগ্রহও তৈরি হয়নি। কিছুদিন পরে আমি খুব অসহায় বোধ শুরু করলাম। কোন কিছুর কূল কিনারা না পেয়ে বুঝে গেলাম আমার হয়ত সত্য ধর্ম খুজে পাওয়া হবে না। আমি কিছুটা স্বস্তি খুঁজে পেলাম বৌদ্ধ ধর্মে। তথাপি আমি জানতাম এটাই সেই সত্য ধর্ম নয় যা আমি খুঁজে ফিরছি।

অতঃপর গবেষণার গভীরতার শুরু হয় জাপানে। সেখানে কাটানো সময়টি আমার জীবনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। জাপানে মূলত আমি আমার উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষের বছরটি কাটাই। আমার চিন্তা ভাবনায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে এই সময়টিতে। আমার পরিবারের দেয়া শিক্ষা, সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতি নীতি বা নারীবাদ সম্পর্কে যে ধারনা আমার ছিল সেখানে অসম্ভব প্রভাব ফেলেছিল। আমি এটা জাপানেই অনুধাবন করতে পারি যে, পুরুষ এবং মহিলা আসলেই একই অধিকার পেতে পারে। সমাজে সম্মানের সাথে একই ভূমিকা পালন করতে পারে। জাপানের পরিবারগুলোর কাছ থেকে আমি যে সহায়তা পেয়েছি সেটা আমাকে আরো বেশি অনুভব করিয়েছে এদের গভীর সংহতি। যা দূর্ভাগ্যক্রমে আমরা পশ্চিমা বিশ্বে খুজে পাইনা। আমি এই সময়ে বৌদ্ধদের অনুশীলনগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলাম। আমি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসি, তখন একটি গাড়ি দূর্ঘটনার শিকার হই। আমি একজন মেকানিকের সন্ধান পেলাম যে কিনা অল্প খরচেই গাড়িটি ঠিক করে দিতে পারবে। আমি যখন আমার গাড়িটি তার কাছে নিয়ে পৌঁছালাম তখন তার স্ত্রী আমাকে ভেতরে আমন্ত্রণ করলেন। আমি খুব অবাক হয়ে দেখলাম তিনি একটি দীর্ঘ স্কার্ট পড়েছিলেন। সেইসাথে মাথার উপর জড়ানো ছিল হিজাব। এ

ধরনের পোশাক আমি শুধুমাত্র জিওগ্রাফি চ্যানেলেই দেখেছি। আমি আস্তে ধীরে তাকে তার বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চাইলাম।

আমার একের পর এক প্রশ্নের উত্তর সে দিচ্ছিল বেশ সাবলীল এবং সুন্দর ভাবে। আমার মনে হচ্ছিল আমি যে মূলনীতির কাঠামো তৈরি করেছিলাম তার উত্তরগুলো পেয়ে যাচ্ছি। তার স্বামী আমার গাড়িটির কাজ শেষ করার আগে তিনি আমাকে তার বাড়িতে অনুষ্ঠিত মহিলাদের জন্য একটি সাপ্তাহিক স্টাডি সার্কেলে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি সেখানে ছয় মাস পর্যন্ত উপস্থিত ছিলাম। আর একদিন আসলো যখন আমার কাছে জানতে চাওয়া হ'ল আমি ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত কিনা। আমি একমত হলাম তাদের সাথে। কেননা, আমি বুঝতে পেরেছিলাম ইসলাম সেই ধর্ম যা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এর ভেতর বাহির জানার জন্য আমাকে এর মাঝেই প্রবেশ করতে হবে। পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। আমি যদি পেছন ফিরে তাকাই তাহলে দেখা যাবে, আমার সকল ধর্ম থকে ফিরে আসার কারণ হ'ল সন্দেহ এবং বিশ্বাসের অভাব। আমার কাছে বিশ্বাসের প্রধান শর্ত হলো সেটার সত্যতার প্রমাণ। আমার জন্য সন্দেহ একটি নিয়ম ছিল। এমনকি সর্বাধিক প্রদর্শিত বৈজ্ঞানিক আইনও সন্দেহের শিকার হতে পারে। আর সেখানে অদৃশ্যে বিশ্বাস করতে হয়েছিল আমাকে। যদিও এমন নয় যে, আমি প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ছিলাম সেই সময়। আমি মাত্র শুরু করেছিলাম জানতে। একটি ছোট শিশুর মত হাটি হাটি পা করে শিখছিলাম। এটি আমার জন্য একটি নতুন সূচনা ছিল যেখানে আমি শিখছিলাম এবং বড় হচ্ছিলাম। তবে এমন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে যখন মনে হত আমি অনেক কিছু জেনে গিয়েছি, ঠিক তখনি কেউ না কেউ এসে আমাকে নতুন কিছু জানিয়ে যেত।

মসজিদে আরব বোনরা তাদের বোনদের আরবী ভাষায় শিক্ষা দিত এবং পাকিস্তানীরা উর্দুতে। কিন্তু ইংরেজিতে কিছু শেখানোর উদ্যোগ কেউ নেননি তখনো। সুতরাং যদিও আমি ইসলামের নবীন, তবুও আমি পাঠ প্রস্তুত করার চেষ্টা করতে শুরু করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ এটা করতে গিয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি নিজে ছিলাম নতুন এবং সেইসাথে আমি ইংরেজিতে পাঠদানের কাজও করছিলাম। কারো কোন দিক- নির্দেশনা ছাড়া এই কাজটি ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। বেশ কয়েক বছর পর আমি ফিকহ, আক্বীদা এবং কুরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু করলাম। এই পড়াশুনায় আমি যেমন প্রতিবার বিস্মিত হচ্ছিলাম ঠিক তেমনি আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বেও পড়েছিলাম। আমার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত কিছু শায়খের সাথে কথা বলাছিলাম। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করতে। কিন্তু আমি সন্তুষ্ট না হয়ে বরং হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।

অন্যান্য সময় এই যুক্তিতেই আমি ধর্মান্তরিত হতাম। কিন্তু এখানে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি এর সঠিক উত্তর পাই আমি এর গভীরে ডুবে যাব। প্রায় এক বছর পরে আমি এক সকালে জেগে দেখলাম আমার সমস্ত জয়েন্টগুলি ফুলে গেছে এবং ব্যথা হচ্ছে। আমার অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে এবং আমার স্মরণ শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। যার ফলে গুরুতর সমস্যা শুরু হয়। আমার জন্য এক বিরাট ধাক্কা! একমাস পরীক্ষার পরে চিকিৎসকরা আমাকে জানিয়েছিল যে, তারা বিশ্বাস করেন আমি লিম্ফোমার শেষ পর্যায়ে আছি এবং বেঁচে থাকার জন্য আমার খুব কম সময় হাতে আছে। পরে অবশ্য তারা তাদের মতামত পরিবর্তন করে আমাকে সারকয়েডোসিস রোগ নির্ণয় করে। যা একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ, যা দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে প্রভাবিত করতে পারে। আমি যেন হাতে আরো কিছুটা সময় পেলাম নিজের জীবনকে জানার। যদিও আমার অবস্থা তখন খুব বেশী ভালো ছিল না। তবে ধীরে ধীরে আমার অবস্থার উন্নতি হতে থাকে।

আলহামদুলিল্লাহ শরীরের উন্নতির সাথে সাথে আমি আরো একটি সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি স্থির করলাম ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহযুক্ত কিছুর সামনে আমি আর দাঁড়াবো না। তবে আমি পূর্বের ন্যায় অন্যদের অনুবাদের উপর নির্ভরশীলও আর হবো না। আমি স্থির করেছিলাম যে, এর সাথে মোকাবিলা করার একমাত্র উপায় হল অনুবাদ পড়ার পরিবর্তে আরবী শেখা এবং নিজের জন্য গবেষণা করা। এরপরেই আমি মরক্কো এবং সিরিয়ায় পড়াশোনা করা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে এবং মিশর এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদের সাথে পরামর্শ করেছি এবং শেষ পর্যন্ত আমি স্থির করেছিলাম যে মিশর আমার পক্ষে সেরা হবে। *(তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট)*

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং নিয়মিতভাবে দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, নবীদের কাহিনী, প্রশ্নোত্তর পর্ব, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreek.tv@gmail.com

জীবনের বাঁকে বাঁকে

হতাশায় ভোগা যুবসমাজ

-এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ, রাজশাহী।

অনেকটা অনধিকার চর্চা করে জিজ্ঞাসা করলাম, এই যুবক! তুমি এখানে কি করছ? যুবক বলল, বসে আছি। তোমার নাম কি? যুবক উত্তর দিল, শামীম। নাম শুনে জিজ্ঞাসা করলাম- তুমি কারো জন্য অপেক্ষা করছ? উত্তর দিল আমার বন্ধুরা আসবে তাই অপেক্ষা করছি। এর মধ্যেই দামী একটি মটর সাইকেলে দু'জন যুবক এসে হাজির। বসে থাকা যুবক ঐ দু'জন যুবকের সাথে মটর সাইকেলে উঠে যেতে চাইলে ওদেরকে একটু দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তোমরা এখন কোথায় যাবে? ওরা বলল মহলে। মহল সে আবার কি? উত্তর দিল- ও আপনি বুঝবেন না। এই যুবক একটু বুঝিয়ে বল দেখি, মহল কি? ওখানে তোমরা কি কর? আর কেনইবা ওখানে দল ধরে যাচ্ছ? একজন বলল মহল হচ্ছে আমাদের আড্ডাখানা। তাহলে আড্ডাখানা না বলে মহল বলছ কেন? তারা বলল, আড্ডাখানা বললে অনেকে খারাপ মনে করে। তাই আমরা মহল বলি। বিষয়টি বুঝতে পারলাম। এই তিনজন যুবক কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে? নিশ্চয়ই আড্ডাখানায় নেশা করার জন্য।

বললাম, তোমরা কোথায় যাচ্ছ আমি বুঝেছি? যাও সমস্যা নেই, কিন্তু তোমরা কি আমার কিছু কথা শুনবে? ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল- শুনবো, বলেন। তোমরা কোন না কোন মা-বাবার সন্তান। তোমাদের প্রত্যেকেরই দায়-দায়িত্ব আছে। তবে কোন দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছিলে? বাক্যটি বলার সাথে সাথে ওরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে লজ্জামিশ্রিত হাসিতে বলল, না মানে ওটা কোন দায়িত্ব না। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কথা-বার্তা বলা আর জাস্ট একটু আড্ডা দেওয়া এই আর কি? তেমন কোন বিষয় না। বললাম তোমরা লেখাপড়া কর? বলল হ্যাঁ করি। কোন ক্লাশে? উত্তর দিল ইন্টারে। ও, সবাই এক সাথে। বলল, হ্যাঁ একই সাথে। যেই মা-বাবার মাধ্যমে এই দুনিয়ায় এসেছো, সেই মা-বাবা তোমাদের জন্য অর্থ ব্যয় করছেন, তোমরা যাতে মানুষ হতে পার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পার। প্রতিটা মা-বাবার একই ইচ্ছা। কিন্তু সেটা না হয়ে হচ্ছে উল্টোটা। প্রশ্ন করলাম, তোমরা ঐ পথে গেলে কেন? ওরা হতাশ হয়েই বলল, লেখাপড়া শিখে কি লাভ? চাকুরী নেই, কাজ নেই। আজ যুবকরা বেকার, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেও কোন চাকুরী নেই, কর্মসংস্থান হয় না। যেমন ধরুন মেধাবীকে বানান হচ্ছে মেধাশূন্য, আর মেধাশূন্যকে বানান হচ্ছে মেধাবী। তাহলে লেখাপড়া শিখে কি হবে? বললাম, তোমাদের কথাগুলো শুনলাম। তবে লেখাপড়া না শিখে তোমরা ধ্বংস হওয়ার পথ বেছে নিচ্ছ। এটা কেউই মানতে রাযী হবে না। কারণ ঐ পথটি সবার জন্যই অভিশপ্ত। সবার জন্যই আপত্তিকর। তাই ঐ পথে নয়, শিক্ষার আলো জ্বালানোর জন্যই তোমাদের শিক্ষা অর্জন করতে হবে। মা-বাবার আশা পূরণ করার জন্যই শিক্ষা লাভ করতে হবে। লাভ হবে জাতির, লাভ হবে দেশের, লাভ হবে সবার। ওরা আনমনে মাথা নাড়ল। অন্তরে ক থাগুলো কতটুকু ঢুকলো, কে জানে? এরপর ওরা তিনজন মটর সাইকেলে চড়ে সালাম দিয়ে চলে গেল। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। মনে কল্পনা করলাম আর দোআ করলাম, তারা যেন ঐ পথে আর না চলে।

আমি ভাবতে থাকি, যুবকদের বিষয়ে পরিবার, সমাজ ও দায়িত্বশীল প্রতিনিধিগণ সকলেই বোধহয় ব্যর্থ। যেখানে যুবকদের সঠিক পথে পরিচালিত করে তাদের যৌবনের উদ্যমকে কাজে লাগানোর দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল পরিবারের, সমাজের, জনপ্রতিনিধিদের, সেখানে আজকে আমরা সবাই ব্যর্থ। পারিবারিকভাবে ছোট্ট অবস্থায় যদি বাবা-মা শিশুদের পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তোলার কাজে সময় দিতেন, তাহলে ঐ শিশুই আজকের যুবক হয়ে উঠত উন্নত চরিত্রে চরিত্রবান। একজন যুবকও নেশাগ্রস্ত হয়ে ধ্বংস হ'ত না। নষ্ট হ'ত না তার সম্ভাবনাময় উঠতি জীবন। পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশ পেত একটি সুন্দর যুবসমাজ। আসলে সমাজে ধরেছে ঘুন। সেই ঘুনে সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এই ঘুনে ধরা সমাজের পরিবর্তন কবে কখন হবে, তা বলা মুশকিল। সমাজ সুন্দর ও স্বচ্ছ হোক, এটা সমাজপতিদের অনেকেই চান না। নোংরা পরিবেশে সমাজ পরিচালিত হ'লে সমাজপতিদের বেশী লাভ। আমরা সবাই জানি, যুবসমাজ কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে। কেন ধ্বংস হচ্ছে। আবার আমরা বলে থাকি যুবকরাই দেশের ভবিষ্যত, জাতির মূল জনশক্তি। কিন্তু যুবকদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা বা একজন চরিত্রবান যুবক হিসাবে গড়ে তোলা বা তাদেরকে ধ্বংসের পথ হতে রক্ষা করে সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনা- এই সব বিষয়গুলো হ'তে আমাদের অবস্থান অনেক দূরে। একজন নেশায় আসক্ত যুবককে নেশামুক্ত করার কাজে আমরা সময় দিতে চাই না। কেবল ব্যাক্যালাপের মধ্যেই আমাদের কর্ম সীমাবদ্ধ থাকে। ময়দানে নেই।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যুবশাখা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দেশের তরুণ ছাত্র ও সর্বসাধারণ যুবশক্তিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জান্নাত পিয়াসী যুবশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে নামে কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ বলেন, (হে বিশ্বাসীগণ) তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা সংঘবদ্ধভাবে মানুষকে ভাল কাজে অনুপ্রাণিত করবে আর অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। তাহলেই তোমরা সকলকাম হবে' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। ভাল কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করার জন্যই 'যুবসংঘ'-এর জন্ম। এখানে যুবকরা হতাশায় ভুগবে এমন অবকাশ নেই। যে যুবকরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে উঠবে তার মধ্যে কোন হতাশা থাকতে পারে না। বরং এতে আছে উদ্দীপনা, আছে জাগরণ, আছে জান্নাতে যাওয়ার সুমহান প্রেরণা। এখানে যুবকেরা যাবতীয় অপকর্ম থেকে বিরত থাকে। শিরক ও বিদ'আত মুক্ত জীবন যাপন করার কাজে ব্যস্ত থাকে। সর্বপরি জীবনটাকে সফল ও স্বার্থক করে গড়ে তুলতে সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালায়। অতএব আসুন! মাদকের ছোবল হতে যুবসমাজকে রক্ষার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি। তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করি হতাশা নয়, মাদক নয়, অহীর আলোয় উদ্ভাসিত জীবন গড়াই হ'ল জীবনের প্রকৃত সুখের ঠিকানা। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন! আমীন!!

সংগঠন সংবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন

রাজশাহী ২৮শে আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় নওদাপাড়া রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পরামর্শক্রমে 'যুবসংঘ'-এর ২০২০-২০২২ সেশনের সভাপতি হিসাবে ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবকে পুনরায় মনোনীত করা হয়। বাদ মাগরিব 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনে নবমনোনীত সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী) ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট)-এর বায়'আত গ্রহণ করেন, মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

অতঃপর ১০ই সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আছর কেন্দ্রীয় কমিটির ২০২০-২০২২ সেশনের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ঘোষণা করা হয় এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত নবমনোনীত সদস্যদের বায়'আত গ্রহণ করেন। কমিটির অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ হ'লেন সহ-সভাপতি মুখতারুল ইসলাম (রাজশাহী), সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যাহীর (কুমিল্লা), অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম (রাজশাহী), প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ (ঝিনাইদহ), প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা), ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর (জয়পুরহাট), তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন (বগুড়া), সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল (রাজশাহী), সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান (সাতক্ষীরা) ও দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব (রাজশাহী)।

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২০

আহলেহাদীছ আন্দোলন আপোষহীন ইসলামী আন্দোলন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টা হ'তে রাত ৯-টা পর্যন্ত রাজশাহীর নওদাপাড়ায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, আহলেহাদীছ 'যুবসংঘ'-এর জন্ম হয়েছিল বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচারের জন্য। বাংলাদেশে যে ইসলাম চলছে তা বিশুদ্ধ ইসলাম নয়। আমাদের প্রত্যেককে জীবনের প্রতিটি কাজের হিসাব আল্লাহর নিকট দিতে হবে।

তিনি বলেন, কোন অবস্থাতেই হককে বাতিলের সাথে মিশানো যাবে না। দুনিয়ায় আহলেহাদীছরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের পাহারাদার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আহলেহাদীছদের ঘরেই কুলখানি হয়েছে। তারাই শবেবরাত ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে। তাই তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরিয়ে আনতে আমাদেরকে 'যুবসংঘ' করতে হয়েছে। 'যুবসংঘে'র দাওয়াতের মাধ্যমে এদেশে বিশুদ্ধ ইসলামের বীজ রোপিত হয়েছে। শিরক ও বিদ'আত বিদূরিত হয়ে প্রকৃত সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাই 'যুবসংঘে'র ছেলেদেরকে আমাদের নছীহত, তোমাদেরকে আক্বীদায় হতে হবে মযবূত ও আচরণে থাকতে হবে নরম।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাওয়াত ছিল প্রথমে আক্বীদা সংশোধনের। তিনি প্রথমে ওযূ-গোসল শিখাননি। কেননা মানুষকে প্রথমে বুঝতে হবে, সে কার দাসত্ব করবে আল্লাহ্র, না শয়তানের? আল্লাহ বলেন, হে মানুষ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁকে তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না *(নিসা ৪/৩৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅত প্রাপ্তির আগে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ায় তাঁকে নানারূপ অপবাদ ও নির্যাতনের শিকার হ'তে হয়। কিন্তু তিনি দাওয়াত থেকে পিছপা হননি। আমাদেরকে একইভাবে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। সার্বিক জীবনে আমরা আল্লাহর বিধান মেনে চলব। আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সার্বিক জীবন পরিচালিত হবে অহি-র বিধান অনুযায়ী। এই দাওয়াত ইতিমধ্যে মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ফলে ক'দিন আগেও ভোলাতে যারা আহলেহাদীছ মসজিদ জ্বালিয়ে দিয়েছিল তারাই আজ সেখানে মসজিদ তৈরীর জন্য জমি দিচ্ছে। তাই মানুষ যখন বুঝবে যে, এটাই জান্নাতের পথ, তখন তাদেরকে এ পথ থেকে কেউ ফিরাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তিনি যুবসংঘের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনার বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের হেফাযত ও এশা'আত দু'টিই করে যেতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের ইবাদত হবে স্রেফ আল্লাহ্র জন্য। আমাদের ইত্তেবা হবে স্রেফ রাসূলের জন্য এবং আমাদের আমল হবে স্রেফ আল্লাহ্র জন্য। যেখানে কোন 'রিয়া' থাকবে না।

ভাষণের শুরুতে মাননীয় প্রধান অতিথি প্রথমে লণ্ডনসহ বিদেশী মেহমানদের প্রতি এবং সংগঠনের দেশ-বিদেশের নেতা-কর্মীদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে ইংরেজীতে ভাষণ দেন। অতঃপর পাকিস্তানী মেহমানের প্রতি উর্দূতে এবং সবশেষে দেশীয় ভাইদের উদ্দেশ্যে বাংলায় বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য যে, করোনা মহামারীর কারণে উক্ত সম্মেলনটি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয় এবং তা ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব বলেন, যুবসমাজকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনের প্রতি মনোযোগী হ'তে হবে, যেন শিরক ও বিদ'আতের ঘন আঁধারে নিমজ্জিত মুসলিম সমাজে তাওহীদ ও সুন্নাহর জাগরণ নিশ্চিত করা যায়। 'যুবসংঘে'র প্রত্যেক কর্মীকে আদর্শবাদী হ'তে হবে এবং নিজেকে দাঈ ইলাল্লাহ হিসাবে প্রস্তুত করতে হবে। তিনি প্রত্যেককে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ থাকার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী (পাবনা), আল-ফোরক্বান ইসলামিক সেন্টার, বাহরাইন-এর দাঈ শরীফুল ইসলাম মাদানী ও মাওলানা মুখলেছুর রহমান মাদানী (নওগাঁ)।

সম্মেলনে বিদেশী অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লন্ডনের সেক্রেটারী জেনারেল ড. ছুহায়েব হাসান (পাকিস্তানের খ্যাতনামা আলেম মরহূম মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসানের জ্যেষ্ঠ পুত্র), লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ডীন ও প্রফেসর ড. হাম্মাদ লাখভী, জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের চীফ অর্গানাইজার (আল্লামা ইহসান এলাহী যহীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র) হাফেয ইবতিসাম ইলাহী যহীর, আহলেহাদীছ ইউথফোর্স পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফায়ছাল আফযাল এবং ফিলিস্তীনের গাযার তরুণ শিক্ষক ও গবেষক ড. হাসান নাছর বাযাযো প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন'-এর প্রবাসী শাখার দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন সঊদী আরব শাখার সভাপতি মুশফিকুর রহমান, সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মীযানুর রহমান, সিঙ্গাপুর শাখার সভাপতি শফীকুল ইসলাম, মালয়েশিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক আল-আমীন, কাতার শাখার যুগ্ম-আহ্বায়ক আব্দুল হক এবং সাইপ্রাস শাখার আহ্বায়ক কাছীদুল হক কুতুব।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি যিল্লুর রহমান, বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান, কুমিল্লা যেলা সভাপতি আহমাদুল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মুজাহিদুর রহমান, বগুড়া যেলা সভাপতি আল-আমীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বায়ক মুহাম্মাদ ফেরদাউস, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আসাদুল্লাহ আল-গালিব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আব্দুর রঊফ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মোছাদ্দেক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ও ফরীদুল ইসলামের নেতৃত্বে আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট) ও প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর (কুমিল্লা)।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম সরকারের নিকট ১৯ দফা প্রস্তাবনা ও দাবী পেশ করেন। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান দাবীগুলো নিম্নরূপ :

১. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

২. স্কুল-মাদ্রাসার সিলেবাস থেকে ইসলামবিরোধী বিষয়সমূহ অপসারণ করতে হবে এবং কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ছহীহ আক্বীদা শিক্ষা দিতে হবে।

৩. এ সম্মেলন কাদিয়ানী, হিজবুত তাওহীদ, দেওয়ানবাগীসহ ইসলামের নামে ভ্রান্ত ফের্কাসমূহের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।

৪. বাবরী মসজিদে ভেঙ্গে তদস্থলে রাম মন্দির নির্মাণের বিরুদ্ধে এ সম্মেলন তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

৫. ধর্ষণের শাস্তির ক্ষেত্রে পৃথক আইন প্রণয়ন করা হৌক। স্বল্প সময়ের মধ্যে ধর্ষক চিহ্নিত করা এবং দ্রুততার সাথে জনসম্মুখে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করলে এ ব্যাপারে অপরাধীদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এছাড়া বিবাহ বহির্ভূত যেকোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তি বিধান করা এবং বিবাহকে অধিক উৎসাহিত করা ও বয়সের বাধাকে উঠিয়ে দেয়া হৌক।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ৮৮.৪%।
২. প্রশ্ন : ১১তম দেশ হিসাবে কোন দেশ করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারক হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে?
উত্তর : বাংলাদেশ।
৩. প্রশ্ন : তৃতীয়বারের মত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হন কে?
উত্তর : ফজলে কবির।
৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নতুন প্রধান কে?
উত্তর : রিয়াল অ্যাডমিরাল মোহাম্মাদ শাহীন ইকবাল।
৫. প্রশ্ন : বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সর্বোচ্চ বয়সসীমা কত? উত্তর : ৬৭ বছর।
৬. প্রশ্ন : জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী প্রেরণে বাংলাদেশ কততম?
উত্তর : দ্বিতীয়।
৭. প্রশ্ন : বিশ্বব্যাংকের শ্রেণীবিন্যাসে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় কত? উত্তর : ১৯৪০ মার্কিন ডলার।
৮. প্রশ্ন : দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকল বন্ধ ঘোষণা করা হয় কবে?
উত্তর : ১লা জুলাই ২০২০।
১. প্রশ্ন : PPP'র ভিত্তিতে মাথাপিছু আয়ে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর :১৪৯তম।
২. প্রশ্ন : GDP-তে বিশ্বে বাংলাদেশ কততম?
উত্তর : ৪১তম।
৯. প্রশ্ন : জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : অষ্টম।
১০. বর্তমানে বাংলাদেশ কতটি পণ্য রপ্তানি করে?
উত্তর : ৭৫০টি।
১১. চা রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে কততম?
উত্তর : ৬৪তম *(পূর্বে ছিল ৬১তম)*।
১২. প্রশ্ন : ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সর্বাধিক রেমিটেন্স আসে কোন দেশ থেকে?
উত্তর : সৌদি আরব; দ্বিতীয় সংযুক্ত আরব আমিরাত।
১৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ১৭তম হাইকমিশনার কে? উত্তর : বিক্রম দোরাইস্বামী।
১৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার কত?
উত্তর : ১,১২৫ জন।
১৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার কত?
উত্তর : ৭৪.৪%।
১৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশীদের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কত?
উত্তর : ৭২.৬ বছর।
১৭. প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যে কোন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত 'বর্ষসেরা চিকিৎসক' হিসাবে মনোনিত হন?
উত্তর : ফারজানা হোসাইন।
১৮. প্রশ্ন : কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের নাম কী?

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : আয়া সোফিয়ায় কত বছর পর জুম'আর ছালাত অনুষ্ঠিত হ'ল? উত্তর : ৮৬ বছর পর।
২. প্রশ্ন : সার্কভুক্ত কোন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক? উত্তর : আফগানিস্থান; ৩.৪%।
৩. সার্কভুক্ত কোন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম?।
উত্তর : শ্রীলংকা; ০.৫%।
৪. বর্তমানে ইস্রাঈল কি ধরনের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে?
উত্তর : সামরিক নযরদারীর লক্ষ্যে গোয়েন্দা কৃত্রিম উপগ্রহ।
৫. প্রশ্ন : বর্তমানে অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে কোন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন?
উত্তর : তিউনিশিয়ার প্রধানমন্ত্রী এলিস ফাখফাখ।
৬. প্রশ্ন : ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
উত্তর : জ্যাঁ ক্যাসটক্স।
৭. প্রশ্ন : বিশ্বে দ্রুততম সুপার কম্পিউটার কোনটি?
উত্তর : Fujitsu Fugaku
৮. প্রশ্ন : এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (AIIB) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর : ৮২টি।
৯. প্রশ্ন : জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক কোন দেশে?
উত্তর : বাহরাইন।
১০. প্রশ্ন : জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন কোন দেশে?
উত্তর : লিথুয়ানিয়া।
১১. জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।
১২. প্রশ্ন : মাথাপিছু জাতীয় আয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : সুইজারল্যান্ড।
১৩. প্রশ্ন : PPP'র ভিত্তিতে মাথাপিছু আয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : কাতার।
১৪. কাশ্মীরী ভাষায় 'গালওয়ান' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : ডাকাত।
১৫. প্রশ্ন : ২০২০ সালে টেকসই উন্নয়নে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : সুইডেন।
১৬. প্রশ্ন : ইউরো মুদ্রায় কোন দুটি দেশ যুক্ত হয়েছে?
উত্তর : বুলগেরিয়া ও ক্রোয়েশিয়া।
১৭. প্রশ্ন : নারী প্রতি সর্বাধিক প্রজনন হারের দেশ কোনটি?
উত্তর : নাইজার; ৬.৭ জন।
১৮. প্রশ্ন : পাসপোর্ট মূল্যায়ন সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : জাপান।
১৯. প্রশ্ন : বিশ্বের শীর্ষ বিলিয়নিয়ার কে?
উত্তর : জেফ বেজোস (১৮,৯২০ কোটি ডলার)।
২০. প্রশ্ন : মানচিত্রে অষ্টম মহাদেশের নাম কী?
উত্তর : জিল্যান্ডিয়া।
২১. প্রশ্ন : কানাডার প্রথম মুসলিম অভিবাসী গভর্নর কে?
উত্তর : সালমা লাখানি (উগান্ডা বংশোদ্ভূত)।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর নাম কয় জায়গায় আলোচনা হয়েছে?
উত্তর : ২ জায়গায়।

২. প্রশ্ন : তিনি কার পরে নবী হয়ে এসেছিলেন?
উত্তর : হযরত হিযক্বীল (আঃ)-এর পর।

৩. প্রশ্ন : তিনি কোন অঞ্চলে প্রেরিত হয়েছিলেন?
উত্তর : দামেস্কের পশ্চিমে বা'লা বাক্কা অঞ্চলে।

৪. প্রশ্ন : ইলিয়াস (আঃ)-এর জন্ম কোথায় হয়েছিল?
উত্তর : ফিলিস্তীন পার্শ্ববর্তী জর্ডানের আল'আদ নামক স্থানে।

৫. প্রশ্ন : সুলায়মান (আঃ)-এর উত্তরসূরী কয়ভাগে ভাগ হয়েছিল? উত্তর : দুভাগে।

৬. প্রশ্ন : 'ইয়াহূদিয়াহ' সম্প্রদায়ের রাজধানী কোথায় ছিল?
উত্তর : বায়তুল মুক্বাদ্দাস, ফিলিস্তীন।

৭. প্রশ্ন : ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের রাজধানী কোথায় ছিল?
উত্তর : তৎকালীন সামেরাহ (বর্তমানে নাবলুসে)।

৮. প্রশ্ন : ইস্রাঈল'-এর শাসনকর্তার নাম কি ছিল?
উত্তর : 'আখিয়াব' বা 'আখীব'।

৯. প্রশ্ন : 'আখিয়াব'-এর স্ত্রীর নাম কি ছিল?
উত্তর : 'ইযবীল'।

১০. প্রশ্ন : তারা কোন মূর্তির পূজা করত?
উত্তর : (بعل) বা'ল নামক মূর্তির।

১১. প্রশ্ন : কে ইলিয়াস (আঃ)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল?
উত্তর : ইস্রাঈলের শাসক আখিয়াব ও তার স্ত্রী।

১২. প্রশ্ন : কোন নবী পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে দূর্ভিক্ষ নাযিলের প্রার্থনা করেছিলেন।
উত্তর : হযরত ইলিয়াস (আঃ)।

১৩. প্রশ্ন : কোন কওম 'বা'ল' দেবতার সাড়ে চারশ' নবী আছে মনে করত।
উত্তর : হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর কওম।

১৪. প্রশ্ন : আল্লাহ ও বা'ল দেবতার নামে কোথায় কুরবানী পেশ করেছিল।
উত্তর : 'কোহে কারমাল' নামক পাহাড়ের উপত্যকায়।

১৫. প্রশ্ন : বা'ল দেবতার সামনে আখিয়াব ও তার প্রজারা কি করেছিল?
উত্তর : বা'ল দেবতার সামনে কুরবানী পেশ করার পর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করে। কিন্তু দেবতার সাড়া তারা পায়নি।

১৬. প্রশ্ন : ইলিয়াস (আঃ)-এর কুরবানী কিভাবে কবুল হয়েছিল?
উত্তর : আগুন এসে তা ভস্মিভূত করে ফেলেছিল?

১৭. প্রশ্ন : কুরবানীর অভাবনীয় দৃশ্য দেখে কারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।
উত্তর : অনেক বেদ্বীন সাথে সাথে সিজাদায় অবনত হয়ে ইলিয়াস (আঃ)-এর দ্বীন কবুল করেছিল।

১৮. প্রশ্ন : কারা ইলিয়াসের দ্বীন কবুল করেনি?
উত্তর : যিদের বশে হঠকারী ধর্মীয় নেতারা।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

আর উচ্চ আদালতের জটিলতা কাটিয়ে মাত্র ০.৩৭% মামলায় দণ্ডাদেশ কার্যকর হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০১১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৬টি যেলায় ধর্ষণের অভিযোগে ৪৩৭২টি মামলা হয়েছে। কিন্তু দোষী সাব্যস্ত করা গেছে মাত্র ৫জনকে। অর্থাৎ মুখে মুখে আইনের বুলি কপচানো হ'লেও বাস্তবে এসব মামলা ও আইনী ব্যবস্থা কেবল প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। শুধু তাই নয়, অর্থ ও ক্ষমতার দাপটে প্রকৃত দোষীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আড়ালে থেকে যায়। সুতরাং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে গেলে প্রচলিত এই বিচারব্যবস্থার আশু পরিবর্তন কিংবা সংস্কারের কোন বিকল্প নেই। ইসলামের কঠোর বিচারব্যবস্থা যদি চালু করা যেত, তবে নিঃসন্দেহে নারীর প্রতি সহিংসতার হার বহুলাংশেই নিবারণ করা সম্ভব হ'ত।

সর্বোপরি নারীদের প্রতি আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিরাট ত্রুটি রয়ে গেছে। আমাদের পরিবারে ও সমাজে ইসলামের নৈতিক শিক্ষার চর্চা না থাকায় নারীদেরকে একদল মানুষ ভোগ্যপণ্য মনে করে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে, অপরদল নিছক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মনে করে। অথচ পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুষ্ঠু সমাজ গঠনের তাদের ভূমিকাও অপরিসীম। তারা কখনও আমাদের মা, কখনও বোন, কখনও স্ত্রী, কখনও কন্যা। একশ্রেণীর বিপথগামী নারীদের কারণে নারীদের প্রতি আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে পারে না। সুতরাং পরিবার ও সমাজে নারীর যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে দৃষ্টির হেফাযতসহ তাদের প্রতি ইসলামের নির্দেশিত হক্বগুলো আদায় করতে হবে। পরিবার ও সমাজে এই আদর্শিক মূল্যবোধের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। নতুবা শুধু আইন দিয়ে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয়।

পরিশেষে যুবসমাজের প্রতি আহ্বান থাকবে, একজন পুরুষ যদি নারীকে নিজের মা-বোনের আসনে রাখে, তবে তাদের প্রতি অসংগত বা অভব্য আচরণের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। সুতরাং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে শক্তিশালী করুন। আল্লাহকে ভয় করুন। নিজের ব্যক্তিত্বের সুরক্ষা ও চারিত্রিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রাখতে চাইলে অবশ্যই নারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। যদি তা না থাকে, তবে যেকোন সময় চারিত্রিক অধঃপতন নেমে আসবে। অতএব আসুন নিজেরা সর্বোতভাবে পবিত্র থাকি এবং নিজেদের ব্যক্তিত্বে সুস্থ চিন্তা ও ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাই। সেই সাথে সমাজকেও পবিত্র রাখার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। প্রচলিত কিশোর গ্যাং কালচার, বয়ফ্রেণ্ড-গার্লফ্রেণ্ড কালচার, বখাটেপনা, ইভটিজিং, যেনা-ব্যভিচার ও পর্দাহীনতা প্রভৃতি সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চারকণ্ঠ হই। এভাবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যদি আমরা একটি সচেতন, জাগ্রত ও আল্লাহভীরু প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারি, তাহলে এসব অপরাধ সামাজিকভাবেই দমন হবে ইনশাআল্লাহ। সরকারের প্রতিও আমাদের আহ্বান থাকবে- কেবল ধর্ষণের বিরুদ্ধে কেতাবী আইন নয়; বরং বাস্তবতার ময়দানে এই জঘন্য পাপাচারের উৎসমুখগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তা সমাধানের জন্য সর্বাত্মক ও বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে যাবতীয় অন্যায় ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে ইসলামের রূপরেখা মেনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের তাওফীক দান করুন। আমীন!